মাথুর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ; ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

মুক্তিবুলি এখন যেখানে চলে গেছে,
সেখানে এ বই পৌঁছোবে না
জানি। তবু ওকেই দিলাম।

এই লেখকের

মধুমতী (২য় সং)

রঙ্গরাগ (২য় সং)

রাতভোর (২য় সং)

চন্দনডাঙার হাট

মৌনবসন্ত

রাগিণী (২য় সং)

পঙ্কজা

"বন্দে গুরুনীশ ভক্তানীশমীশবতার কান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্॥"

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান—তিনের স্মরণ॥"

১

গভীর রাত্রে অন্ধকার মাঠের মাঝখানে ছোট স্টেশনটি মনে হবে যেন একটি মরা পাখির মতো ডানা মেলে পড়ে আছে। কলকাতা শহরের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের মাঝখানে স্টেশনটি। বোধ্ হয় বিগত যুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল।

এখান থেকে সোজা পুবমুখো মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে। সামনে পড়বে একটি বনের ধারে মস্ত একটা ডোবা। নিথর জলের ওপর বনের কালো ছায়া। দু-একটা খাটাশ অথবা হায়না হয়তো বেরিয়ে আসবে শব্দ পেলে। ভয় পেলে চলবে না।

চলে যেতে হবে এবার দক্ষিণ-পশ্চিম কোনাকুনি। নজরে পড়বে বিরাট আকাশের তলায় কয়েকটি কালো বিন্দুর মতো গুটিকতক ঘর নিয়ে একখানি গ্রাম। মাটির ঘর কয়েকখানা, কয়েকটি টিনের চালা, একটি মোটে পাকা দালান।

সামনে কলাবাগান—তার ধারে গোঁসাইয়ের ঘর। আরও এগিয়ে এলে মস্ত এক কামরাঙা গাছ। আরও এগোতে হবে। সামনের বাড়িটার ঘরের পাশে একটা সজনে গাছ। দুটো পাখি ডানা ঝাপটে চলে যায়।

পাশের ঘরে দেখা যায় প্রদীপ জ্বলছে একটি। অতি ক্ষীণ আলোয় আবছা মনে হয় মেয়েটির ছায়া। বসে আছে। নিশ্চল হয়ে বসে আছে রূপমঞ্জরী। খুব সন্তর্পণে কান পেতে থাকলে শোনা যায় কী যেন বলছে। রাত তখন অনেক। ঝিঁঝিঁর শব্দের ভেতর দিয়েও শোনা যাবে রূপমঞ্জরী বলছে,—বলছে না, গাইছে। ফিসফিস করে গাইছে—নামকীর্তন।

চোখের পল্লব দুটি বোজা। রসকলি-আঁকা টিকালো নাকের পাতাদুটি ফুলে ফুলে উঠছে। হাঁটু দুটি মুড়ে বসেছে। কাঁপছে রূপমঞ্জরী। থরথর করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে বেঁকে উঠছে সর্বশরীর। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। চোখের জলে কণ্ঠের তিলক ভিজে ধুয়ে গেছে।

স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু। বৈষ্ণবীয় আবেশের সব কটি চিহ্ন সুস্পষ্ট ওর দেহে।

বাইরের চেতনা সব মুছে গেছে মন থেকে। ওর মন ডুবে গেছে গভীরে। এক অপরূপ নদীর ধারে। ধূ ধূ মাঠ। সবুজে ভরা মাঠ। মাঝে মাঝে গাছ আর লতাকুঞ্জ। অনেক দূরে চলে যায় মন।

সাক্ষাৎ মেলে দাঁড়িয়ে আছে সে। পদ্মকর্ণিকার মতো ডাগর চোখদুটো মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গেরুয়া রঙে ছোপানো কাপড় পরনে। গায়ে চাদর। হাতে একটি থলি, সেটিও গেরুয়া।

সবুজ সমুদ্রে একটি গেরুয়া প্রাণবিন্দু।

রোমাঞ্চিতা হয়েছে রূপমঞ্জরী। আবার কেঁপে ওঠে বারে বারে। রূপানুরাগের শুদ্ধ আবেশে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তেমনি দাঁড়িয়েই আছে। শান্ত শীতল চোখদুটো টলমল করে তার। রূপমঞ্জরী ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হাত দুখানা ধরেছে।

কাঁপতে কাঁপতে পায়ের ওপর পড়ে যায়।

গভীর রাত্রে ঘরের ভিতর একা একা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে ও। অনেকক্ষণ। ও তখন যেখানে; সেখানে কালের হিসেব পৌঁছোয় না।

অনেক পরে আস্তে আস্তে চোখ মেলে রূপমঞ্জরী। ভোর হতে আর দেরি নেই তখন। কামরাঙা গাছের ওধারে গ্রামের সীমানায় আকাশের প্রান্ত লাল হয়ে উঠছে।

উঠে বসে রূপমঞ্জরী। চোখ মুছে অগোছালো শাড়ি ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে আবার।

পরম তৃপ্তিতে অনেক জলঝরা চোখদুটি ওর চিকচিক করে। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস বইছে। গায়ে শাড়ির আঁচলখানি ও আরও ভালো করে জড়ায়।

সে এসেছিল। কথা দিয়েছিল দেখা দেবে। দিয়েছে।

রসাবেশে ভরে দিয়ে চলে গেছে তাকে। মনের কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই। ভরে উঠছে ও।

এমন মাঝে মাঝেই আসে সে আবেশে—আভাসে।

একথা মানুষকে বললে মানুষ হাসবে। তারা তো জানে না কত কঠিন নিষ্ঠুর সত্য রয়েছে এর পেছনে। তারা বুঝবে না বৈষ্ণবকন্যা রূপমঞ্জরীর শুদ্ধ আবেশের আনন্দ।

বুঝতে হলে ছ-বছর আগের এক কাহিনী শোনাতে হয়। তারও আগে বলতে হয় এ গাঁয়ের কথা। রূপমঞ্জরীর বাবার কথা।

বৈষ্ণব-প্রধান গ্রাম। এক সাধক গোস্বামীর কৃপা-ছায়ার তলায় এরা বাস করেছে নিরুদ্বেগে নির্বিঘ্নে। শীতল মধুর ভাবটুও ছুঁয়ে থাকত সকলকে সর্বদা। তৃণাদপি সুনীচেন—যেন এঁদের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল কথাটা। এঁরা 'উত্তম হঞা আপনারে মানে তৃণাধম। দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।' এ ছাড়া 'জীবে সম্মান দিত জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।'

এমনও শোনা যায়, ছয় গোঁসাইয়ের এক গোঁসাই স্বয়ং এসে এঁদের কৃপা করেছিলেন বহুকাল আগে।

এই গ্রামেরই ঘোষাল মশায়ের একটি ছেলে একটি মেয়ে। ঘোষাল মশাই সদ্‌ব্রাহ্মণ শুধু নন, পরম বৈষ্ণব। শুধু কণ্ঠী নয়। প্রতিদিন ভোরে স্নান সেরে ছোট আর্শিটি বের করে কপালে, নাকে, কণ্ঠে, বুকে, পিঠে হলদে তিলকমাটির তিলক কাটতেন। ভজনা বন্দনা না করে জলগ্রহণ করতেন না। সন্ধ্যায় প্রতিদিন নাম সংকীর্তন করতেন নিজে। গাঁয়ের আরও দু-চারজন আসত। সবাই আসত, প্রণত হত ঘোষাল মশাইয়ের কাছে। অথচ ঘোষাল মশাই সকলের কাছে হাতজোড় করেই থাকতেন।

তিনি স্বয়ং গোঁসাইয়ের দীক্ষিত। তাঁর দীক্ষার পরই গোঁসাই চলে গেলেন বৃন্দাবনের আশ্রমে। আর ফিরে এলেন না। গোঁসাইয়ের ভিটে পড়ে রইল শূন্য। ঘোষাল মশাইয়ের বাড়ির কাছেই।

ঘোষাল মশাইয়ের জমিজমা কিছু ছিল। তিনি চাইলেন ছেলে শশিনাথকে জমিজমার কাজের উপযোগী করে তুলতে। কিন্তু শশিনাথকে দিয়ে কিছুই হল না। পড়াশুনো হল না। জমির কাজের ধার দিয়েও গেল না। শখের যাত্রাদলে ঘুরে বেড়াতেই ওর ঝোঁকটা ছিল বেশী। নিমাই সন্ন্যাসে নিতাইয়ের পাট ছিল ওর বাঁধা। গলাটি কিন্তু ওর মিষ্টি। অভিনয়ের সময়ে সত্যি সত্যি কেঁদে ভাসিয়ে দিত ও গাইতে গাইতে।

এমনি কিন্তু তিলক-কণ্ঠী ধারণ করত না শশিনাথ। সন্ধ্যেবেলা বাবার সঙ্গে নামকীর্তনেও বসত না। তবু কৃষ্ণপ্রীতি ওদের মজ্জাগত। বিনয়-ভক্তি স্বভাবগত।

মেয়েরা সবাই কিন্তু তিলক ধারণ করত। শশিনাথের ছোট বোন রূপমঞ্জরী। সন্ধ্যায় প্রতিদিন বসত রূপমঞ্জরী বাবার সঙ্গে নামকীর্তনে। নাম করতে করতে ভোমরার মতো কালো চোখদুটো ওর স্তিমিত হয়ে আসত। দুলত আনন্দে।

দিনগুলো কাটছিল। এর ভেতর শশিনাথের মা দেহ রাখলেন। রূপমঞ্জরী তখনও ছোট। বছর এগারো-বারো বয়েস।

শশিনাথ একটু গম্ভীর হল মায়ের মৃত্যুর পরে।

বাবা ধরে বসলেন,— গদাধর চাটুজ্জের মেয়ে। ভক্তের ঘর। ওই মেয়েই ঘরে আনব। শশিনাথ বাধা দিল না।

মা নেই। রূপমঞ্জরী ছোট। সংসার দেখবার একটা মানুষ তো চাই।

গদাধর চাটুজ্জের মেয়েই ঘরে এল।

শশিনাথ বললে ফুলশয্যার রাত্রে,—নাকছবিটি খুলে ফেলো।

পনেরো বছরের মেয়ে, বেনারসীতে মোড়া। সুগন্ধি ফুলে ঠাসা।

গোল মুখের ওপর চাপা নাকটি লুকোবার জন্যেই বোধ হয় ঘোমটা টেনে দিলে আরও। শশিনাথ পান খেল একটা। একটু জর্দা।

বললে,—নাম কি তোমার ?

অতি সাধারণ প্রশ্ন। চিরকেলে উত্তর আসে,—শ্রীমতী সরমা বালা দেবী। বলতে বলতে লজ্জায় জড়িয়ে আসে সরমার কণ্ঠ।

—মানে সরমা।

ঘাড় নাড়ে কি নাড়ে না, বোঝা যায় না।

তারপর—তোমাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে।

অথবা—কাছে এসো।

নয়তো—ঘোমটা খোলো।

তারপর কানে কানে গুঞ্জনের পালা।

পারে না কিন্তু। সরমা সরে যায়।

ফুল নিয়ে খেলা করে শশিনাথ।

রাত কেটে যায়।

সকালে উঠে শশিনাথের নিজেকে খুব সুখী মনে হয়।

শশিনাথ সুখী হল।

সুখী হল ওর বাবা ঘোষাল মশাইও।

সব চেয়ে বেশী রূপমঞ্জরী।

বিকেলে চুল বাঁধা। সরমার চাপা নাকে মোটা করে রসকলি আঁকা—এ সব ওই এক ফোঁটা মেয়ে রূপমঞ্জরীর নিত্যকাজ।

রসকলি আঁকবার সময় নাকছবিটি খুলে ফেলে সরমা। শশিনাথ বলেছে তার দেখতে ভালো লাগে না।

রূপমঞ্জরী অবাক।—ওকি গো। বেশ তো মানিয়েছিল।

সরমা রাঙা হয়ে ওঠে,—না ভাই ঠাকুরঝি। কেমন সুড়সুড় করে। ভালো লাগে না।

মঞ্জরী আর কথা বলে না।

সরমা হেসে বলে,—তাছাড়া আমাকে মানায়ও না। ওটা তোমার তরতরে নাকে মানাবে ভালো। তোমাকে দোব।

মঞ্জরী খুশী। সত্যিই ওর নাকটি টিকালো মুখখানি সুগোল নয় সরমার মতো। চিবুকটি নরম। নেমে এসেছে সরু হয়ে। চোখদুটি সুদীর্ঘায়ত নয়। তবু চোখের পল্লব ঘন ছায়ার মতো। এমনিতেই যেন কাজলপরা মনে হয়। রূপমঞ্জরী রূপসী।

সরমা ওর চিবুকটা ধরে নাড়া দেয়।—নাকছবিটি কেমন মানাবে বলো তো!

—ছাই মানাবে।—নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হয় মঞ্জরী।

চুল বাঁধা, গা ধোয়া সারা হয়।

সন্ধ্যায় আজ বিশেষ সমারোহে নামকীর্তন।

শশিনাথ আজ যোগদান করেছে।

আগে থেকেই গুনগুন করে রূপমঞ্জরী—ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণের নাম রে!

শশিনাথ ধমকায়—থাম্।

রূপমঞ্জরী চমকে চুপ করে।

দাওয়ার ওপর বৃন্দারানীকে ফুলসজ্জায় সাজানো হয়েছে।

তুলসীগাছ বলতে নেই। মঞ্জরীর বাবা শিখিয়েছে—উনি বৃন্দারানী।

তলায় বাবাজী ঠাকুরের খড়ম জোড়া। ফুলে ঢাকা।

শশিনাথও আজ চোখ দুটো বুজে প্রণাম করে।

ওর বাবা আসে চন্দনের বাটি নিয়ে।

পড়শী দু-চারজন এসেছেন। চন্দনের বাটিতে একটি সাদা গন্ধরাজ ফুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে সকলের কপালে চন্দন সুলেপন করে শশিনাথের বাবা। সবাই প্রণাম করে।

খোল-করতালে ঝংকার শুরু হয়।

বেশ লাগে। বড় সুন্দর লাগে। আগাগোড়া সবকিছুই যেন নয়নাভিরাম মনে হয় রূপমঞ্জরীর। এমন সুশোভন পরিবেশে যেন ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় সবাইকে। বাড়ির মজুর-জন ওই রামহরিকেও। রূপমঞ্জরীর চোখের পল্লব নেমে আসে।

ধীরে ধীরে শুরু হয় শ্রীগুরু বন্দনা, শ্রীগৌর বন্দনা, তারপর যথারীতি নামকীর্তন।

শশিনাথও আজ পরম আনন্দে ডুবে যেতে চায়।

মনটা আজ যেন উদার হয়েছে শশিনাথের। সরমাকে ভালো লেগেছে। তাই বুঝি ভালো লাগছে সব।

শশিনাথের বাবার দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ে। শশীনাথ স্থিত হল। রূপমঞ্জরীর একটা বাসা দেখিয়ে দিতে পারা তার আর একমাত্র কাজ।

দিন কাটে। বিয়ের পর শশিনাথের শুধু শুধু ঘুরে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। একটা কিছু না করতে পারলে নিজের পুরুষ পরিচয়টার আর মানে পাওয়া যাচ্ছে না, বিশেষ করে সরমার কাছে একটু নীচু নীচু লাগছে যেন।

বাবাকে একদিন দুপুরে বললে শশিনাথ,—একটা দোকান করব বাজারে। সাহাদের কাপড়ের দোকানের পাশে একটা ঘর পাওয়া গেছে।

ওর বাবা মুখ তুলল অবাক হয়ে,—কিসের দোকান।

—কেন, মনিহারী। হিমানী, পাউডার, কাঁটা, ফিতে, বিস্কুট, লবেঞ্চুস, খাতা, পেন্সিল, বেশ লাভ আছে এতে।

—সে তো অনেক টাকা লাগবে।

শশিনাথ বাবাকে বোঝায়,—কিচ্ছু নয়। শ তিনেক টাকা প্রথম চোটে লাগবে।

ওর বাবা একটু ইতস্তত করে,—তার চেয়ে বরং মুদীখানা।

—না, বাবা, ও সুবিধে হবে না। মনিহারীতে লাভ বেশ। কলকাতা থেকে মাল আনব মাসে দুবার। ওই হাঁদুর সঙ্গে যাব। ও সব ঘাতঘোত জানে।

—কিন্তু তিনশ টাকা!—ওর বাবা দুবার হাঁই তোলে।

শশিনাথের ইচ্ছেটা এবার বলেই ফেলে,—দীঘির পাশের জমিটা যদি বিক্রি করা যায়!

—জমি বিক্রি !—একটু বিরক্ত হয়ে তাকায় ওর বাবা। বলে একটু চুপ করে থেকে,—তার চেয়ে বরং তোর মায়ের হারছড়া বিক্রি করলে ভালো হয়।

শশিনাথের কিন্তু এতে আপত্তি,—মায়ের গলার হার !

—কিন্তু জমি যে তার চেয়েও দামী।

তবে তাই হোক। শশিনাথ আর কথা বাড়ায় না।

হার বিক্রি করেও আরও কিছু ধার করতে হয়। মনিহারী দোকান পেতে বসে শশিনাথ। এতদিনে সে কাজের মানুষ হতে পারে। ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়। ফেরে দুপুরে। আবার বিকেলে বেরোয়, ফেরে রাত্রে। যেদিন কলকাতায় যেতে হয় সওদায় সেদিন তো দুপুরে ফেরাই হয় না। কলকাতার হোটেলেই খেয়ে নেয়। রাত্রে ফেরে ক্লান্ত হয়ে।

সরমা পাখা আনে, বাতাস করে।

যতটা খাটুনি না হয় তার চেয়ে একটু বেশী শ্রান্ত বলে নিজেকে জাহির করে শশিনাথ, অস্ফুটে হয়তো বলে,—উঃ! হাত-পা সব ব্যথা ধরে গেছে।

ইচ্ছেটা সরমা আরও ব্যস্ত হোক। আরও গলে পড়ুক সমবেদনায়।

ইচ্ছে পূর্ণও হয়। সরমা বাতাস করবার পর ঠাকুরের প্রসাদী খান ছয়েক বাতাসা ও একগেলাস জল কাছে রাখে।

—জলটুকু খেয়ে জিরোও বসে। আমি ঠাঁই করে খাবার জোগাড় করি।

খুব খুশী শশিনাথ।

খাওয়া সেরে ওঠবার সময় একবার তাকায় সরমার দিকে।

বলে,—আমার জন্যে এত রাত বসে থাকতে তোমার কষ্ট হয়। তার চেয়ে বরং আমার ভাতটা ঢাকা দিয়ে রেখে খেয়ে নিলেই পারো।

কথাটা নিতান্তই মুখের —অন্তরের নয়।

সরমাও বোঝে। সলজ্জ হেসে বলে,—ধুস্! তা কখনো হয়। তোমার আগে খাওয়া!

—কেন হবে না। আমি তো অনুমতি দিচ্ছি।

—যাও। বাজে বোকো না। শোওগে যাও। আলোটা জ্বালিয়ে নিও।

শশিনাথ পরম তৃপ্তি নিয়ে ওঠে।

সরমা কিছুক্ষণ পরে খেয়ে আসে।

দুজনে নানা গল্প শুরু হয় তখন।

শশিনাথ বলে,—কলকাতায় ওস্তাদ খুঁজছি একজন। গানটা শিখতেই হবে।

সরমা বলে,—তোমার এমন গলা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই বরং শেখো। আচ্ছা, গান শিখতে হলে কি কলকাতায় থাকতে হবে তোমার? থাকা-টাকা চলবে না।

শশিনাথ আশ্বাস দেয়,—থাকতে হবে কেন? কলকাতা থেকে শেষ ট্রেনে ফিরতে হবে। অনেক রাত হবে হয়তো।

—বেশী রাত হলে একা একা বুঝি ভয় করবে না আমার?

—কেন? মঞ্জরীকে নিয়ে শুয়ে থাকবে।

সরমা তবু কেমন কেমন করে। যেন এখনি ভাবতে ভয় পাচ্ছে। হাতটা চেপে ধরে শশিনাথের।

শশিনাথ হাসে,—বড্ড ভীতু তুমি।

হাঁই তোলে শশিনাথ। ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়ে এক সময় গল্প করতে করতে।

আরও দিন কাটে। এবার ঘোষাল মশাই দেহ রাখলেন। শশিনাথ বাবার মৃত্যুতে কাঁদল না বড় একটা। শুধু দুশ্চিন্তায় নুয়ে পড়ল। রূপমঞ্জরী বড় হয়ে উঠেছে। আঠারো পেরিয়ে যেতে চলেছে। ভালো ঘর, ভালো বর অনেক খুঁজেও মিলছে না। বাবা মারা গেল। সংসারের সবটুকু দায়িত্ব এসে পড়ল ওর কাঁধে। তার ওপর একটি ছেলেও হয়েছে শশিনাথের। বছর দুয়েক বয়স।

চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল শশিনাথ।

সরমা ভরসা দিলে,—অত ভাবনা করে কি লাভ শুনি। যা হবার হবে।

শশিনাথ তবুও ভরসা পায় না।

রূপমঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে।

জমিজমা কোথায় কি আছে ও ভালো করে খোঁজ করে নি কখনও। সেগুলো সব দেখেশুনে নিতে হবে। দোকানটিকে চালু রাখতেই হবে। তার ওপর রূপমঞ্জরীর একটা ব্যবস্থা। টাকা কই? বিয়ে হবে কি করে?

শশিনাথ বসে বসে ভাবে।

রূপমঞ্জরীও বসে আছে। ঠাকুরঘরের দাওয়ায়।

সরমা ছেলে কোলে নিয়ে আসে,—একটু ধরবে ঠাকুরঝি খোকাকে।

একটা কথাও বলে না মঞ্জরী। তেমনি চুপ করে বসে থাকে। সরমা চলে যায় অগত্যা। ভাইবোনকে নিয়ে হয়েছে সব চেয়ে মুশকিল। তবুও মুষড়ে পড়ে না সরমা।

রূপমঞ্জরী বরাবরই একটু চাপা। ওর অতল মনের ভাবগভীরতার সঙ্গে বাইরের হালকা হাসির তুলনা করলে একটু অবাক হতে হয়।

কথায় হাসিতে ঢলে পড়বে। ভেতরে ভাবতরঙ্গ একটুও উছলে পড়বে না কথায় বা কাজে। তাই ওকেই বেশী ভয় সরমার।

ইদানীং সরমাই ওর সঙ্গিনী।

আর একজন ছিল। ঘোষপাড়ার লাবণ্য।

ছোটবেলা থেকেই খেলা করত ও লাবণ্যর সঙ্গে। পুতুল খেলা। পুতুলের বিয়ে। ভোরে উঠে বকুলতলায় ফুল কুড়োতে যেত। ঝাঁপা-ঝাঁপি করে সাঁতার কাটত পুকুরে। সালুক ফুল তুলতে যেত বেতঝোপের কাঁটা পেরিয়ে পুকুরের দক্ষিণে।

এখন আর নেই।

কারণটা অত্যন্ত সামান্য। চোদ্দ বছরে পড়েছে তখন রূপমঞ্জরী। ঠাণ্ডা ভাব ভেতরে থাকলেও ওপর ওপর একটু চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে মঞ্জরীর মনে। জীবনে কোন একটিমাত্র পুরুষ আসতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ লাগে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ

এক ঝলক বাতাস গায়ে লাগলে মনটাও উড়তে চায়। ছোট্ট আরশিতে নাকে রসকলি আঁকবার সময় নিজেকে একটু বেশী সময় দেখতে ইচ্ছে হয়। নুয়ে-পড়া ডাল থেকে জামরুল পাড়তে গিয়ে একটু লাফাতে হলে নিজের দেহভারে নিজে লজ্জিতা হয়ে পড়ে। লজ্জা পেতেও ভালো লাগে। লাবণ্য ওর গায়ে অকারণে হাসতে হাসতে ঢলে পড়লেও ওর খারাপ লাগে না। সেই হাসিতে হাসি মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়।

তবু—। লাবণ্য সেদিন ঘাটে যেতে যেতে যে কথা ওকে বললে, তারপর আর লাবণ্যর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে হয়নি ওর।

লাব [illegible] ার ও দুজন এক সঙ্গেই স্নান করত। অনেকক্ষণ ডুবে ডুবে স্নান। মাঝে মাঝে গা মাজা আর জল কুলকুচি করে ফেলা। বেশ মজা লাগে। সবচেয়ে মজা লাগে জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে।

গল্প করছিল সেদিনও।

হঠাৎ বললে লাবণ্য—তোর সঙ্গে আর তো দেখা না হতেও পারে।

—কেন?—অবাক হয় মঞ্জরী।

লাবণ্য খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিটা অসভ্যের মতো।

—কি হল, হাসছিস কেন?

লাবণ্য হাসতে হাসতে বলে,—অনেক দূরে চলে যাব। আর কখনও হয়তো দেখতে পাবি না।

—সে কিরে?—মঞ্জরী অবাক।

—দেখবি।

—কার সঙ্গে যাবি? তোর বাবা কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?

—বাবা নয়। আর একজন যাচ্ছে।

—আর একজন? সে আবার কে?

কানে কানে বলে লাবণ্য—আমার বর।

বলেই আবার হাসতে থাকে।

রূপমঞ্জরী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে,—বিয়ে হল না। বর আবার কোথা থেকে এল?

বলে লাবণ্য চোখে এক অপরূপ ভাব এনে,—বিয়ে না হলে বুঝি বর হতে নেই!

মঞ্জরী একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর স্বরে বলে,—চল ভাই। বেলা হয়ে গেল।

লাবণ্য ওর আকস্মিক গাম্ভীর্যে একটু ক্ষুণ্ণ হয়।

বলে,—কেন তোর বুঝি ভালো লাগছে না।

মঞ্জরী স্পষ্ট বলে,—না ভাই ভালো লাগছে না।

লাবণ্য একটু রেগে যায়। তার জীবনের এতবড় এক গোপন রোমাঞ্চকর সংবাদকে রূপমঞ্জরী শুধু উপেক্ষাই করছে না। তার ওপর রীতিমতো দোষারোপ করছে।

লাবণ্য বলে ফেলে,—হিংসে হচ্ছে বুঝি?

রূপমঞ্জরী আহত হয়। নিঃশব্দে জল থেকে আস্তে আস্তে উঠে বাড়ি চলে আসে। লাবণ্যও ডাকে না।

আজ পর্যন্তও আর লাবণ্যর সঙ্গে কথা বলে নি ও।

পরে অবশ্য তার কানে এসেছে, লাবণ্যর বাবা শশিনাথের বন্ধু খাঁদুকে উত্তম-মধ্যম দিয়েছে। সংবাদটা নিয়ে খুব জটলাও হয়েছে। লাবণ্যর অনেক দূরে চলে যাওয়া আর হয় নি।

এর পরেই হল শশিনাথের বিয়ে। রূপমঞ্জরী সঙ্গিনী পেল। সরমাও যে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করত না এমন নয়। বলত কখনো-সখনো,—তোমার বর ভাই ভূ-ভারতে মিলবে না। সগগ থেকে নেমে আসবে।

অনেক খোঁজাখুজি করেও বিয়ে হচ্ছে না মঞ্জরীর। তাই এই ঠাট্টা।

মঞ্জরী ঠাট্টাটা হজম করে হেসে বলে,—স্বর্গেও নেই।

সরমা জিভ কামড়ে বলে,—বলতে নেই। গোঁসাই করুন, দেবতার মতো বর পাও।

রূপমঞ্জরী বলে গম্ভীর হলে,—গোঁসাইয়ের কৃপা হলে হেঁটে আসবে দোরের সামনে।

রূপমঞ্জরীর কথার গাম্ভীর্যে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সরমা।

রূপমঞ্জরী ঠাকুরঘরে যায় বৈকালী দিতে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। আঠারোয় পড়তে পড়তেই বাবা মারা গেল। আঠারো বছরে বিয়ে হল না, আর হয়তো বা বিয়েই হবে না। ধারণাটা সকলেরই। শশিনাথেরও। বিয়ের চেষ্টা কমে গেল।

শশিনাথও বলতে শুরু করল ওর বাবার মতো,—বামুনের ঘরে বিয়ে যদি না-ই হয়, পড়ে থাকবে গৌরগোবিন্দের পায়ে। জীবনটা কেটে যাবে।

অর্থাৎ নিতান্তই ভাগ্যহীনা মঞ্জরী।

মঞ্জরী কথা বলে না। সংসারের কাজ আর ঠাকুরের কাজে মন দিতে চেষ্টা করে। সব সময়ই কাজে থাকবার চেষ্টা করে।

সেদিন বিকেলে শশিনাথ এল কলকাতা থেকে। দোকানের সওদা করতে গিয়েছিল। দোকান হয়ে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে একটি লোক, তার হাতে একটি তানপুরা। বাঁ হাতে একটি থলে।

লোকটিকে বাইরের দাওয়ায় বসিয়ে ভেতরে আসে শশিনাথ। একগাল হেসে তানপুরায় একটা টংকার দিয়ে বলে,—জন্ম সার্থক হল।

সরমা তেঁতুলের বীচি ছাড়াচ্ছিল,—অবাক হয়ে বলে,—ও কি অমন করছ কেন? শশিনাথ হাতের থলেটা নামায়।—কথা বোলো না। থলের ভেতর খাবার আছে। চা আছে। ভালো করে চা বানাও দিকি। খুব আচ্ছা করে!

সরমা বলে,—কি হল বলো না। অত লাফালাফি করছ কেন?

শশিনাথ বলে,—বাইরে গিয়ে দেখো কে এসেছে।

—কে?

—দেখোই না।

—দেখতে আমার দায় পড়েছে।—মুখে বলে সরমা, কিন্তু বঁটিটা কাত করে রেখে ওঠে। বাইরে দাওয়ায় একটি লোককে বসে থাকতে দেখে।

—কে গো ?

—সেই যে বলেছিলুম। ওস্তাদ খুঁজছিলুম গান শেখবার জন্য। ইনি মস্ত বড় ওস্তাদ। আনন্দলাল।

—রোজ আসবে নাকি ?

শশিনাথ হেসে ওঠে,—খেপেছ! সেই মানুষ! একদিন ওঁর পায়ের ধুলো পড়লে লোক ধন্যি হয়ে যায়। কত বলেকয়ে আজ এনেছি বাড়িতে। গান শোনাব সবাইকে। তুমি খাবার চা ঠিক করো দিকি। মঞ্জরী কই ?

সরমা এতক্ষণে হাসে,—তাই বলো। ঠাকুরঝি গা ধুতে গেছে। আমি যাচ্ছি রান্নাঘরে। সরমা ওঠে। একটু ঘোমটা টেনে দাওয়ার বাইরে এসে রান্নাঘরের দিকে যায়।

শশিনাথ গাঁয়ের সবাইকে খবর দিতে যায়। কত বড় ওস্তাদ এসেছে তার বাড়ি। গান হবে। সবাইকে আনতে হবে। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আর হয়তো উনি এমন পচা গাঁয়ে কখনও আসবেন না।

দাওয়ায় বসে আনন্দলাল। কলকাতার গাইয়ে আনন্দলাল। ওঁর মেসে থেকেই দিনকতক হল গান শিখত শশিনাথ। অনেক কাতর অনুরোধ করে আজ আনন্দলালকে আনতে পেরেছে এখানে। আনন্দলালও ভাবল, মন্দ কি, বেড়িয়ে আসা যাক একটু নির্জন গ্রামে। হয়তো ভালোই লাগবে। জুয়াড়ী নেশাখোর আনন্দলাল। টকটকে ফরসা রঙ। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে সামনের দিকটা। চোখদুটো ছোট ছোট—বড় চঞ্চল, চতুর। যেন কত বুঝেও কিছুই ভ্রূক্ষেপ করে না।

মদ খায়। গান গায়। মোটা মোটা ইংরিজী বই পড়ে। মেসে থাকে। মেসের টাকা অনেক বাকি পড়ে গেলে পালায়। কোথায়, কেউ জানে না। কোথা থেকে কতকগুলি টাকা যোগাড় করে আবার আসে মেসে। কেউ বলে বি-এসসি পাশ। কেউ বলে এম-এ। আনন্দলালকে জিজ্ঞেস করলে উড়িয়ে দেয়—বলে,—মনে নেই ওসব। বাজি এসো কিছু। তবে বলব।

কি পাশ বলবে, তাও জুয়া! আচ্ছা জুয়াড়ী!

প্রশ্নকারী চলে যায়। আনন্দলাল হাসে।

সন্ধ্যেবেলা কয়েকটি ছাত্র আসে গান শিখতে। ইদানীং শশিনাথ একজন।

গান শুরু করে আনন্দলাল। চোখ দুটো বুজে গান ধরে। ছায়ানট অথবা ইমন।

মৃদু আলাপের গুঞ্জনে ছোট ঘরটি সুরময় হয়ে ওঠে।

শশিনাথ দেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছে যেন।

হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এসেছে নিজের বাড়িতে।

দাওয়ায় বসে আনন্দলাল একটা সিগারেট ধরায়। একটু দূরে সজনে গাছের ফাঁকে আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। চোখে আমেজ আসে আনন্দলালের। পূরবীর আমেজ। আজকের সূর্যাস্তের রঙটা মনের রঙের সঙ্গে এক করে নেবার চেষ্টা করছে আনন্দলাল। বাতাসে ওর শার্টের কলার ওড়ে কানের পাশে। এক সুমধুর আরামে চোখদুটো আধবোজা করে ধোঁয়া ছাড়ে আনন্দলাল।

কিছুটা দূরে একরাশ কলাগাছের ভিড়। একটির সঙ্গে আর একটি জড়িয়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। তার পাশে উদ্ধত গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে একটি জামগাছ। বুঝতে পারত না আনন্দলাল, যদি না দেখত থোপা থোপা কালো জাম সরু সরু ডালের ফাঁকে ফাঁকে। আনন্দলাল সিগারেটটা শেষ করে আনে। তারপর সিগারেটের টুকরোটি দুটো আঙুলের ফাঁকে বেশ কায়দা করে তুড়ি দেবার মতো করে পিছন দিকে ছোঁড়ে।

—ছি, ছি!

মিষ্টি মেয়ের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে আনন্দলাল।

পেছন ফিরে তাকায়।

ভিজে শাড়িখানার ওপর থেকে সিগারেটের ছাই ঝাড়ছে রূপমঞ্জরী। আবার স্নান করতে হবে ভর সন্ধ্যেবেলা। কে, এই অন্ধ লোকটা!

চোখ তোলে এতক্ষণে মঞ্জরী ভ্রূদুটো কুঁচকে। মুখে ওর রাজ্যের বিরক্তি।

আনন্দলালের চোখের পলক পড়ে না।

শাড়িটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে একটু আড়ালে যাবার আগেই আনন্দলাল উঠে পড়ে। এগিয়ে এসে হাত দুটো জোড় করে বলে—কিছু মনে করবেন না। দেখতে পাই নি। মঞ্জরী লোকটার এগিয়ে আসবার সময় একটু চমকে গেলেও সাহস করে বলে,—কে আপনি? কাকে চাই?

আনন্দলাল মৃদু স্বরেই বলে—শশিনাথের সঙ্গে এসেছি।

মঞ্জরী আরও বিরক্ত হয়। কোথাকার একটা জানোয়ার ধরে এনেছে দাদা, ভদ্রতা জানে না। বাইরের কীর্তনের ছোট ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বলে,—ওই ঘরটায় গিয়ে বসুন। বাড়ির ভেতরটা বসবার জায়গা নয়।

সরমার কানে কথা যেতে রান্নাঘর থেকে বেরোয় সরমা, ঘোমটা টেনে ডাকে,—ঠাকুরঝি!

মঞ্জরী রেগে আর কথা না বলে, ঘাটের দিকে যায়। আবার কাপড় কাচতে হবে। আনন্দলাল মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

পকেট থেকে সিগারেট বার করে আর একটি।

সজনে গাছের পেছনে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

রাঙা আকাশ পাংশু হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। পাণ্ডুর নক্ষত্রগুলো স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ।

ছোট কীর্তন-ঘরটার দিকেই এগোয় আনন্দলাল।

কিন্তু ঢোকে না। দোরের একটা পাল্লার ওপর হাত রেখে একটু হেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকে।

এমন অথৈ আকাশের নীচে মেয়েটির ছোট্ট আবির্ভাব—যেন একটি পরিপূর্ণ ছবি। দেখতে দেখতে চোখ ভরে গেল, মন ভরে গেল।

আজকের সন্ধ্যায় এমন একটি ছবি দেখবার জন্যেই বুঝিবা তার চোখ সৃষ্টি হয়েছিল। মনে হয় ওর হঠাৎ আরও অনেক চোখ থাকলে ওর ভালো হত। আরও পূর্ণ হত ওর দেখা।

রূপমঞ্জরী ফিরল না।

এল শশিনাথ হন্তদন্ত হয়ে।

আনন্দলালের কাছে এসে বলে,—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? দাওয়ায় বসুন।

আনন্দলাল হাসে একটু,—বসবার হুকুম নেই।

—হুকুম নেই? কি বলছেন আপনি!—আকাশ থেকে পড়ে শশিনাথ,—আমার বাড়ি, হুকুম আবার কার হবে?

আনন্দলাল ঠোঁটটা একটু উলটে বললে,—কি জানি ভাই, বললে তো!

—কে বললে?

আনন্দলাল মনে মনে হাসে, বলে, –তা কি করে জানব। আঙুল দেখিয়ে বললে বাইরে বসুন।

শশিনাথ অবাক। দোরের পাশে চুড়ির শব্দ কানে আসে।

অর্থাৎ সরমা ডাকছে।

ও সরমার কাছে যায়। সরমার কাছে শুনে এসে আনন্দলালের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে,—কিছু মনে করবেন না। ক্ষমা করুন, ও ছেলেমানুষ। আমার বোন, মানে মঞ্জরী, একটু সাদাসিদে। ওর কথা গায়ে মাখবেন না। চলুন, বসবেন চলুন। আমি এ ঘরটায় আসরের আয়োজন করি, এই ঘরেই গান হবে।

আনন্দলাল মনে মনে হাসে, ভাবে, মন কি আর আছে যে মনে কিছু করা যাবে।

শশিনাথ ওর হাত ধরে দাওয়ায় আসন পেতে বসায়।

একটা আলো জ্বেলে সামনে রাখে।

রূপমঞ্জরী ফিরেছে। আড় চোখে তাকায় লোকটার দিকে। আবার এসে বসেছে দাওয়ায়। সিগারেট টানছে আবার। ঘরে ঢোকে। শাড়ি বদলিয়ে একটা প্রদীপ নিয়ে ঠাকুরঘরের দিকে এগোয়।

ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেয়। বৈকালী দেয়, ধূপ দেয়।

গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে, গোসাইয়ের শ্রীপাদের উদ্দেশ্যে। তারপর গৌর-গোবিন্দের ভজনার নিয়ম রক্ষা করতে হবে। প্রতি সন্ধ্যায় একটু নাম করতে হবেই। বহুকালের নিয়ম। রূপমঞ্জরী ওর বাবার অবর্তমানে সে নিয়ম রক্ষা করে।

খঞ্জনী জোড়া নিয়ে মৃদু স্বরে নাম ধরে। চোখ দুটিও বুজে আসে। নাকের পাতলা পাতা দুটি ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে আনন্দে।

বড় মধুর লাগে ওর নামকীর্তন। হয়তো বা এ মধুবোধ ওদের বংশের বহু সাধনার সংস্কার। একটু একটু দোলে রূপমঞ্জরী।

'হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥'

ওর বাবার কণ্ঠস্বরে এ শ্লোকটি আজও যেন কানে বাজে।

নাম শেষ করে ও সংযত হবার চেষ্টা করেও ভাববিহ্বলা হয়ে পড়ে।

কি মধুর লাগে!

'এই ছয় গোঁসাইয়ের করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাই মোর করুণার সিন্ধু।
ইহকাল পরকাল দুই কালের বন্ধু।'

বাইরে আনন্দলাল স্থির নিশ্চল। সিগারেটটা হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নেশাখোর আনন্দলাল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে—কানদুটো একাগ্র করে। বাতাসে ভেসে আসে কি মধুর স্বর—'এই ছয় গোঁসাই মোর করুণার সিন্ধু।' কণ্ঠস্বর নয়, অন্তরের ভাবসম্পদ নিয়ে বেরিয়ে আসছে যেন সুর। কথার কথা নয়। বিশ্বাসের অতলতায় অতুলনীয় হয়ে উঠছে কথাগুলো। নেশা ধরে গেছে আনন্দলালের। কার কণ্ঠে এত করুণাঘন অকুণ্ঠ আবেগ!

এত মিষ্টি কি গান হয়!

না। গান হয় না। শুধু নির্জন সন্ধ্যায় বিশাল আকাশের নিচে নিতান্ত ছোট একটি কুঁড়েঘরে কোন এক প্রাণ যদি কাঁদে, অস্ফুট গুঞ্জনে সে বেদনা আনন্দের রূপ নিয়ে ভাষা পায়, তবেই এমন হতে পারে।

আনন্দলাল নতুন এক স্বাদ পেয়েছে। এমন এক সুস্বাদের আভাস ও কখনও পায় নি শহর কলকাতায়।

ততক্ষণে রূপমঞ্জরী বেরিয়ে এসেছে বৃন্দারানীর মঞ্চে। বৃন্দারানীর সামনে প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে মঞ্জরী।

আনন্দলাল দেখে।

রূপমঞ্জরী সরমার ঘরে যায়।

সরমা ওকে ঝামটা দিয়ে ওঠে,—ছি ঠাকুরঝি! অত বড় মানুষটা আমাদের বাড়ি এসেছেন। তাকে তুমি যা নয় তাই বললে?

রূপমঞ্জরী তাকায়।

সরমা বলে যায়,—তোমার দাদা তো রেগে আগুন। বলে মঞ্জরীকে ক্ষমা চাইতে হবে। থাকগে সে কথা। যাও জলখাবার আর চা-টা দিয়ে এসো বাপু।

রূপমঞ্জরী বলে,—আমি যাব?

সরমা ঝঙ্কার দেয়,—তুমি মেয়ে, তুমি যাবে না, তবে কি আমি ঘরের বউ যাব?

রূপমঞ্জরীর মনে তখনও নামের আবেগ রয়েছে। বলে,—দাও।

জলখাবারের থালা এবং এক গেলাস জল হাতে নিয়ে রূপমঞ্জরী দাওয়ার ওপর ওঠে। ওর মাঝে কোন শঙ্কা নেই, লজ্জাবোধও নেই যেন। আবেশে আনমনা হয়েই চলে এসেছে। থালা-গেলাস সামনে রেখে নরম মৃদু স্বরে সহজ ভাবেই বলে,—না জেনে যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন।

হাতজোড় করে নমস্কার করে। এ বিনয় ওদের আশৈশবের শিক্ষা।

মুখর বুদ্ধিমান আনন্দলালও নির্বাক হয়ে যায় ওর আন্তরিক বিনয়ে। মুখের ভদ্রতা নয়, শেখানো কথা নয়, অন্তরের সহজ কথা। আজ প্রত্যক্ষ দেখে মনে হয় আনন্দলালের, সহজ হওয়া বড় সহজ নয়। সহজ কথা সহজে বলা যায় না।

দুর্বিনীত আনন্দলালও বলে ফেলে,—অপরাধ আমারও ছিল।

নিজের স্বরটা নিজের কাছেই বড় বেশী নরম মনে হয়।

রূপমঞ্জরী নমস্কার করে বলে,—খেয়ে নিন। চা নিয়ে আসি।

চা আনতে সরমার কাছে আসে ও।

বলে,—ক্ষমা চেয়ে এলাম। দাও, চা দাও। কিন্তু লোকটি কে বলো তো?

আবেশের ঘোরটা কেটেছে ওর।

সরমা বলে,—ওরে বাবা! কত বড় ওস্তাদ। কলকাতার গানের ওস্তাদ। ও কি যে সে!

—বলো কি! মঞ্জরীও চোখদুটো বড় বড় করে।

সরমা বলে,—তোমার দাদা তো আসর ডেকেছে। গান হবে আজ।

শশিনাথ ঘরে ঢোকে,—আরও দশ-বারো কাপ চা লাগবে। খাঁদুদের বাড়ি থেকে কাপ আনতে পাঠিয়েছি, দুধ আছে তো?

সরমা আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলে,—ভাঁড়ারের ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। ঠাকুরঝি ভাই, বড় হাঁড়িটা বার করে দিচ্ছি ধুয়ে গরম জল চাপিয়ে দাও না?

মঞ্জরী বলে,—এক হাঁড়ি?

—তবে না তো কি?

মঞ্জরী খিলখিল করে হাসে—তোমার তো খুব আন্দাজ বৌদি! বারো কাপ চা করতে এক হাঁড়ি জল?

শশিনাথ মঞ্জরীর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়। আনন্দলালকে অপমান করেছে মঞ্জরী। আনন্দলাল চলে গেলে মঞ্জরীকে ধমকাতে হবে, যাতে কখনও আর কারও সঙ্গে এমন ব্যবহার না করে।

সরমা শশিনাথের চোখের তাকানি দেখে হেসে ফেলে,—বাবা! কি তাকানি। ওগো, ও তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে এসেছে। ওর এমনি বা কি দোষ হয়েছে শুনি? ওকি জানে যে কলকাতা থেকে এতবড় একজন মানুষ এসেছে! জানো ভাই ঠাকুরঝি, আমারও একটু কিছু গলতি হলে ওমনি করে তাকাবে। বুকে কাঁপুনি ধরে অমন চোখ দেখলে।

শশিনাথ একটু অপ্রস্তুত,—কি যে বাজে কথা বলো। যা মঞ্জরী, গরম জলটা তুলে দে। ও না জেনে দুটো কথা বলে ফেলেছে বই তো নয়।

দাদার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে হাসি পায় মঞ্জরীর। বলে,—লোকটি কিন্তু খুব ভালো দাদা। বললে আমারও অপরাধ হয়েছে।

শশিনাথ বলে,—তাই নাকি! তবেই দেখ কত গুণী, তা নইলে কি অমন হয়।

মঞ্জরী বলে,—কই বৌদি, ভদ্দরলোকের চা দাও। জলখাবার খেয়ে হয়তো বসে আছে এতক্ষণ। যাও ছেঁকে দুধ-চিনি মেশাও।

শশিনাথ বলে,—এই মাটি করেছে। এখনও আনন্দদা'র চা দেয়া হয় নি! দশ ঘণ্টা আগে বলে গেলুম।

সরমা আসলে চা তৈরী করতে ভালো জানে না। বলে,—ঠাকুরঝি একটু ছেঁকে দুধ-চিনি মিশিয়ে দাও না। আমি বরং পাটি নামিয়ে দিই। আসরে পাততে হবে তো।

—কিছু দরকার নেই। শশিনাথ বলে,—তোমার ভরসায় নেই। খাঁদুদের বাড়ি থেকে সতরঞ্চি চাদর এসে গেছে। দেখি ওদিকে আবার কদ্দূর হল।

শশিনাথ বেরিয়ে যায়।

মঞ্জরী চা তৈরী করে নিয়ে আবার এগোয় দাওয়ার দিকে।

পূর্বমুখী ঘরের দাওয়ায় বসে আছে আনন্দলাল। ওই ঘরে আগে শশিনাথের বাবা থাকত। এখন মঞ্জরী থাকে। আর দক্ষিণ-মুখো এই ঘরটায় থাকে দাদা। এ ছাড়া ঠাকুরঘর, কীর্তনের ঘর, রান্নাঘর।

বসে বসে দেখে আনন্দলাল। বেশ ছোট্ট বাড়িখানা। লেপাপোঁছা পরিষ্কার তকতকে। এ পাশে কলাবাগান। ও পাশে সজনে গাছ দুটো। উঠোনের কিনারায় পেঁপে গাছ কয়েকটা ছোট ছোট।

সবুজ শীতল ছায়ার নীচে একটুখানি বাসা।

আনন্দলাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ওর জন্ম-কর্ম কলকাতার বুকে। গাঁয়ে যে ও এর আগে আসে নি এমন নয়। কিন্তু এমন নয়নাভিরাম পরিবেশ কখনও চোখে পড়ে নি।

অনেকদিন থেকে ঘৃণা করে এসেছে বোষ্টমদের। টিকি আর খোল, এ দুটো বরদাস্তই করতে পারত না ও। তুলসী-কণ্ঠি-পরা লোক দেখলেই মনে হত ঝানু দালাল অথবা বদমাইসের ভেক। তিলক-টিলক দেখলে ডাবা হুঁকো আর নস্যি-নেয়া পণ্ডিতদের মতো রীতিমত কপটাচারের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত মনে হত।

এক বৈষ্ণবের বাড়ি এসেছে আনন্দলাল। একথা আর অজানা নেই। কিন্তু এমন মনঢালা আবেগ, সহজ সুন্দর পরিবেশ কল্পনাও করতে পারে নি। কণ্ঠি এদের কারো কারো আছে। কিন্তু বেমানান নয়। শশিনাথের অবশ্য নেই; কিন্তু আসবার সময় গাঁয়ের কয়েকটি মানুষের গলায় দেখেছে ও। তিলক-রসকলি এদের আরও সুন্দর করে তুলেছে। সন্ধ্যায় ছোট্ট একটি ঘর থেকে ভেসে আসা নামগান যে এত মধুর হতে পারে বিশ্বাস করতেও পারত না আনন্দলাল এখানে না এলে। কাকের পুচ্ছ পরা নয়,—সত্যিকারের ময়ূরের দেশে এসে পড়েছে ও। প্রতিটি মুহূর্তে আন্তরিকতার স্পর্শ যে এত মিষ্টি লাগে এমন জানলে অন্য তৃষ্ণা থাকত না।

রূপমঞ্জরী চায়ের কাপ রাখে,--বেশী গরম নেই। চুমুক দিন।

আনন্দলাল তাকায়,—রূপমঞ্জরী হাসছে।

—চা নয়। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো?

আনন্দলালের অন্তরের কথা। রূপমঞ্জরীর প্রাণ স্পর্শ করে।

—আনছি। বলে রূপমঞ্জরী নিজের ঘরে গিয়ে পাথরের গেলাসে ঠাণ্ডা জল এনে দেয় হাতে।

আনন্দলাল হাত বাড়িয়ে নেয়। পাথরের গেলাস। কি ঠাণ্ডা! জলটুকু সবটা খেয়ে নেয় ও।

চায়ের কাপ গেলাস নিয়ে নীরবে চলে যেতে চায়।

কানে আসে আনন্দলাল বলছে বেশ আস্তে,—ও ঘরে কি তুমিই গাইছিলে ?

—গান নয়। নাম করছিলুম। তেমনি আস্তে বলে রূপমঞ্জরী।

আনন্দলাল খুশী হয় উত্তরে। সুর মিলিয়ে নাম করা। গান নয়।

—বড় মিষ্টি লাগল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দেয় রূপমঞ্জরী, এবার একটু হেসে,—লাগবেই তো। ওর চেয়ে মিষ্টি আর কি আছে ?

অন্তরের সহজ কথা। একটুও লোক-শোনানো লোক-ভোলানো নয়।

আনন্দলাল খুব খুশী।

রূপমঞ্জরী চলে গেল। গরম জল চড়াতে হবে।

শশিনাথ এসে নিয়ে গেল এবার আনন্দলালকে কীর্তনঘরের আসরে। আসরে গ্রামের সবাই ভিড় করেছে। ঘরে স্থানাভাবে বাইরেও। দেখতে দেখতে শশিনাথের ঘরের দাওয়ায়, রান্নাঘরের দাওয়ায় মেয়েরাও এসেছে।

আনন্দলাল ভিড়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে আবার। সিগারেট ধরায় এবার। সবাই পথ ছেড়ে দেয়। আশে-পাশের দু-একজন ভালো গাইয়েও এসেছে। কীর্তনিয়াও। খোল-করতাল ছাড়াও তবলা হারমোনিয়াম তম্বুরা। সব খাঁদুদের বাড়ি থেকে এসেছে। শশিনাথের বন্ধু খাঁদুরাই এ গ্রামের ভেতর ধনী। খাঁদুরা সঙ্গীত-রসিক--সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও। সরঞ্জাম সবই আছে ওদের বাড়ি। গাইয়ে নেই। খাঁদুদের বাড়ির সবাই এসেছে। লাবণ্যরাও।

আনন্দলাল আসরের ভেতরে গিয়ে বসে। শশিনাথকে বলে ফিসফিস করে,—এলুম বেড়াতে। এ সব কি দরকার ছিল ?

শশিনাথ হেসে বলে,—কিছুই নয়। সবাই আপনার গান শুনতে চায়।

আনন্দলাল বিরক্ত হয়।

আসরে গান গাওয়া আর বাহবা নেওয়া। ও অনেক হয়েছে। ভালো লাগে না আর। সমস্ত রাত গান-বাজনা, সঙ্গে অফুরন্ত নেশা। জীবনভর

চলেছে। আজ আর ভালো লাগছে না। তবু সকলের অনুরোধ, গাইতেই হবে।

—আপনাদের ভেতর একজন আরম্ভ করুন না হয়?

সিগারেটটা টানতে টানতে বলে আনন্দলাল।

গ্রামের একজন গান ধরে। ভাঙা খেয়াল।

চোখদুটো মিটমিট করে আনন্দলালের।

আরও খানিকক্ষণ সময় নেয় আনন্দলাল। আনন্দলালকে গান গাইতেই হবে। নাম নয়—গান। মনে মনে হাসে ও। তম্বুরায় ঝঙ্কার ওঠে। হারমোনিয়ামে সুর ধরে শশিনাথই। সবাই নিশ্চুপ। বাইরে মেয়েরাও কান পেতে আছে। এইবারে গান ধরবে সেই ওস্তাদ। রূপমঞ্জরীও গরমজল নামিয়ে বেরিয়ে আসে।

কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ উঠতে দেরি হবে। বাইরে আলো নেই। আধা অন্ধকারেই বসে আছে সবাই। প্রদীপের ম্লান আলোয় কতটুকুই বা দেখা যায়। এ ওর গা ঘেঁসে বসেছে। নিশ্বাসের শব্দও শোনা যায়।

সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসে কানে। আনন্দলাল গান ধরেছে। ঠুংরী, বেহাগের চালে ধরেছে। গলাটি একটু সরু—বড় সুরেলা, দরদী। কান পেতে শোনে সবাই। ক্রমানুসারে সুর ভাসে রাগের মাধ্যমে। নির্জন নিথর স্থানটি থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। অপূর্ব সুরলীলা। ঠুংরীর মনভরা দরদ।

রাত বাড়ে। আরও গাইতে হয় আনন্দলালকে। আরও। রূপমঞ্জরীও মুগ্ধ হয় কিন্তু বিভ্রান্ত হয় না। চা পাঠিয়ে দেয়। আরও গান হয়।

অনেক রাত্রে আসর ভাঙে, আজ আনন্দলালকে থাকতে হবে। কলকাতায় ফেরা আর হবে না। সরমা রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওরই ভেতর উঠে এসে এসে তদারক করে যায় শশিনাথ।

অনেক রাত্রে খেতে বসে ওরা। শশিনাথের ঘরে। রূপমঞ্জরী পরিবেশন করে, সরমা গরম ভাজা ভেজে দেয়। নিরামিষ সোনা মুগের ডাল ভাতে,

একটু ঘি, একটু ডালনা, একবাটি দুধ। পরম তৃপ্তিতে খায় আনন্দলাল।

শশিনাথ বারে বারেই বলে,—খাবার কষ্ট হল। কি করব। কোন যোগাড় নেই।

আনন্দলাল হাসে,—ভদ্রতা কোরো না ভাই শশী, এমন পেটভরে বহুকাল খাই নি।

কীর্তনের ঘরেই বিছানা হয় আনন্দলালের। শুয়ে পড়ে ও। খাওয়া মিটে যায়। সবাই শুয়ে পড়ে, শশিনাথও।

আনন্দলালের ঘুম আসতে চায় না। উঠে বসে একটা সিগারেট ধরায়। দোরটা খুলে দেয়। পাণ্ডুর আলো এসে পড়ে ঘরে। কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদের আলো, বাইরে তাকিয়ে থাকে আনন্দলাল।

ওর জীবনের কথা কেই বা জানে! কেউ জানে না। কি করেই বা জানবে? প্রথম যৌবন কেটেছে মধ্যপ্রদেশে খাণ্ডোয়া শহরে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। অনেক বয়স পর্যন্ত হাত দিয়ে ভাত খেতে পারত না। মা খাইয়ে দিত। রুপোর অভাব ছিল না, রূপেরও নয়। আনন্দলাল সুপুরুষ রূপবান। বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণ, এইটেই বোধ করি ওর জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। প্রখর মেধা ওকে অলস করেছিল। ছাত্রজীবনে অত্যন্ত অল্প পড়েও যদি শীর্ষস্থান পাওয়া যায়, তবে বেশী পড়বার পরিশ্রম করতে আর কে চায়? সবচেয়ে বিপদ হল ওর যে কোন উগ্র কামনাকে ওর জীবনে সফল করে তুলতে বেশী সময় লাগত না ওর। মানুষকে মুগ্ধ করবার এক অদ্ভুত শক্তি নিয়েই যেন জন্মেছিল ও। সবচেয়ে বড় সম্পদ গান। এমন মধুর সুরভরা স্বর কদাচিৎ শোনা যায়। যে কোন উদ্ধতা তরুণীর মনোহরণ করতে মাত্র দুখানি গানই যথেষ্ট। ওর জীবনে এর অব্যর্থ সফলতার প্রমাণ পেয়েছে ও বহুবার।

এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে সে-ও তো ধরা পড়েছিল। উগ্র দাম্ভিক নায়িকা। এম-এ পড়ত তখন, ছেলেগুলোর চোখের লোভানির দিকে তাকিয়েও দেখত না। সটান দৃষ্টি রেখে সম্রাজ্ঞীর গাম্ভীর্য নিয়ে যেত

আসত। এক অধ্যাপক বন্ধুর মারফত দেখা হল। আনন্দলাল দেখল। মনে মনে হাসল। একটি মিঠে পান চিবোতে চিবোতে গান ধরেছিল। অব্যর্থ শরসন্ধান। দুখানা গান গাইতে হয় নি। অনেক অনুরোধে ও গাইল। সে নিজে অনুরোধ জানাল। সম্রাজ্ঞীর উদ্ধত দৃষ্টি নরম হয়ে এসেছে তখন। বিমুগ্ধা সর্পিনীর মতো ফণা ধরে দুলতে দুলতে বলেছিল,—আর একটি গান গাইবেন ?

—না। স্পষ্ট জবাব দিতে হল আনন্দলালকে মিঠে পান চিবোতে চিবোতে। এও এক সাপুড়ের মন্ত্র সর্পিনী ক্রুদ্ধ, কিন্তু বশ হল।

তারপর ?—দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায় আনন্দলাল। কৃষ্ণা সপ্তমীর মনভাঙা আকাশ। চাপা বেদনায় ভরা পাণ্ডুর জ্যোৎস্না। একটা নিশ্বাস ফেলে আনন্দলাল। আজ মনে হয় জীবনের এক নৃত্যভরা গজলের উগ্র লালসার বিষ নেমে যাচ্ছে। ধমনীর রক্ত জোয়ার আর ভাঙনের লীলায় মত্ত থাকতে চাইছে না। সুশান্ত সুষমায় ভরা এ গ্রামের ছায়া তাকে গভীর করে তুলেছে। অকস্মাৎ মানুষের এমন ভালো লাগতে পারে ? কত ঘাট পার হয়ে এসেছে বোঝা বয়ে বয়ে।

বাবা মা গেল, আনন্দলালের সব গেল। চাকরি নিল। দুদিনের বেশী অফিস যেতে পারল না। দশটা পাঁচটার শেকল-পরা পায়ে স্থির হয়ে থাকা তার ধাতে সইল না। সেই উদ্ধতা সম্রাজ্ঞীর মহিমা তাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে তখন। সেই মহিমান্বিতা তরুণীটি তার পাশে এসে দাঁড়াল আপন মহিমায়।

তারপর আর ভাবতে ভালো লাগে না। একা চুপ করে বসে থাকে আনন্দলাল। শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস এসে কাঁপায় একটু। কোঁচার খোঁটটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে ও।

রাত কেটে গেল, ভোর হয়ে গেল। সূর্য অনেকটা ওপরে উঠেছে।

শশিনাথ এসে ডাকছে,—উঠুন।

আনন্দলাল উঠছে না। পাশ ফিরে শোয় আবার।

অনেকটা বেলায় উঠে বসে।

শশিনাথ আসে,—হাতমুখ ধুয়ে নিন।

—হুঁ।—আনন্দলাল উঠে পড়ে।

ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে সামনে দেখে রূপমঞ্জরী চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকছে।

একটু হেসে বলে আনন্দলাল,—চা নয়।

বেরিয়ে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বসে আনন্দলাল। রূপমঞ্জরী আবার ঘরে ঢোকে। এবার হাতে একটি পাথর-বাটিতে বেলপানা আর একটি ডিশে দুটি সন্দেশ। সন্দেশের ওপর একটি তুলসীপাতা। নিশ্চয়ই প্রসাদী মিষ্টি।

মনটা তৃপ্ত হয় দেখে। বেলপানাটুকু খেয়ে সন্দেশ দুটি খায় ও পরম তৃপ্তিতে। রূপমঞ্জরী জল নিয়ে আসে। আনন্দলাল ভালো করে তাকায় মঞ্জরীর দিকে। হয়তো বা ভোরে স্নান শেষ হয়েছে। জলে ধোয়া মসৃণ মুখের কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই। রসকলিটি অনেক যত্নে আঁকা। কপালে কণ্ঠে তিলক, সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখের ঘন পল্লব।

চোখ ফিরিয়ে আনে আনন্দলাল। না। তাকাবে না সে। হয়তো বা বিগত জীবনের অনেক কালিমা তার চোখে ধরা পড়বে। চোখ নীচু করে আনন্দলাল। বলে,--শশীকে বলো, আমি এখুনি চলে যাবো।

মঞ্জরী বলে,—তা কি করে হয়। আপনার রান্না হয়ে এল!

—না, আমি এখুনি যাব।—চোখ না তুলেই বলে আনন্দলাল।

মঞ্জরী শান্ত স্বরে বলে,—তা হয় না। আপনি সেবা না করে চলে গেলে আমাদের অপরাধ হবে। গোবিন্দ রুষ্ট হবেন, দয়া করে অপরাধী করবেন না।

বিনয়াবনতা মঞ্জরীর কোমলতায় আবার হেরে যায় আনন্দলাল।

—দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি স্নান সেরে আসুন।

মঞ্জরী চলে যায়।

আনন্দলাল নির্বাক হয়ে বসে থাকে।

সেদিনও স্নান-খাওয়া সেরেই যেতে হয় আনন্দলালকে। কলকাতায় ফেরে সে। আবার সেই গানের গুরুগিরি। দু-একদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে আবার। পকেটে যে কটা টাকা ছিল প্রায় শেষ হয়ে আসে। আবার মদ খেতে হয় ওকে। শহরের উগ্র বাতাস আগুন ধরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে। ওই একদিনের এক রাত্রের স্মৃতি ওকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দেয়।

রাতের পর রাত বিনিদ্র কেটে যায়। মদে আর জুয়ায় ডুবে যায় আবার। ভালো যে লাগে তা নয়। ইচ্ছে না থাকলেও সন্ধ্যায় স্নায়ুগুলোর এক অস্বাভাবিক উত্তেজনা সইতে না পেরে ওকে টাকা পকেটে করে বেরোতে হয়।

২

মন্থর দিনগুলো কাটছিল। রূপমঞ্জরী সহজ হয়ে এসেছে অনেকটা। দৈনন্দিন কাজের ভেতর আনন্দ পায় আজকাল। কাজ তো সবই গৌরগোবিন্দ সেবা আর শশিনাথের ছেলের তদারক। রান্না করে সরমা। মঞ্জরীকে করতে দেয় না।

মঞ্জরী বলেছিল,—বাড়া ভাত খেতে ভালো লাগে না বৌদি।

সরমা হেসে বলেছিল,—তবে খেয়ো না।

—তার চেয়ে বরং রান্না করতে দাও না আমায়?

সরমা চোখ বড় বড় করে বলেছিল,—বাবা! শেষকালে পুড়ে-টুড়ে একটা কাণ্ড করে বোস! বিয়ে হতে চাইবে না।

মঞ্জরী বিয়ের কথায় হেসে বলেছিল,—কপাল তো পোড়াই গো। আর পুড়বে কি বলো?

সরমা ওর কথায় একটু ব্যথা পায়,—ওমা, তা কেন হবে! বালাই! তোমার শত্তুরের কপাল পুড়ুক।

—শত্তুর আমার একটিও নেই, নইলে ধরে বেঁধে একজনের গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারলে না আজ অব্দি! বেঁচে গেছি।

সরমা একটু গম্ভীর হয়,—তুমি তো জানো না। বিয়ের সম্বন্ধ অনেক আসে। তোমার দাদার পছন্দ হয় না। কাউকে বলে, ওটা তো তেল বেচে খায়। আবার কেউ এলে বলে,—না, ওর সঙ্গে মঞ্জরীকে মানাবে না। বেঁটে গোপাল! একটা না একটা খুঁত ধরে সব সম্বন্ধ ভেঙে দেবে! যেমন বোন তার তেমনি ভাই!

মঞ্জরীও হাসে,—তোমার বুঝি ইচ্ছে, বেড়াল পার করে দিতে পারলেই বাঁচো। দাদা ঠিকই করেছে। সকলের সঙ্গে তারও বনে না আমারও না।

সরমা হাসে,—চিরকালই এমন ধারা। মুরোদ নেই, পছন্দ ষোল আনা। তোমারও বোধহয় তাই।

মঞ্জরী হাসে,—তা আর হবে না! নইলে এত মেয়ে গাঁয়ে থাকতে বেছে বেছে এমন বৌদি ঘরে এনেছি। পছন্দ আছে কিনা তবেই বোঝ

সরমা মনে মনে খুশী,—আহা! কি পছন্দ! আমি রূপসী, তবেই হয়েছে!

মঞ্জরী বলে,—রূপ তো বাইরের জিনিস নয় ভাই। গোঁসাই বলতেন, রূপের আলো মনে।

সরমা হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে বলে,—আচ্ছা, তোমাদের গোঁসাই এখন কোথায়?

—বৃন্দাবনে।

—এখানে আর আসবেন না?

—কই, বহুদিন তো আসেন না।

—তোমরা দীক্ষা নাও নি?

—না, বাবার হয়েছিল, ছোটবেলায় দেখেছি। কি সুন্দর হাসতেন আর কথা বলতেন আমাদের সঙ্গে, মনে হত আমাদেরই বয়েসী।

—কোথায় থাকতেন এখানে?

—ওই তো গো, কলাবাগানের উত্তরে ভিটে। ওই তো গোঁসাইয়ের ঘর। ওর পিছনে একটি টগর গাছ ছিল। শুনেছি, বাবাকে একবার গোঁসাই টগর ফুল আনতে বলেছিলেন। বাবা আনব বলে বেরুলেন। গিয়ে দেখেন গাছে একটা ফুলও নেই। কি করেন গুরুর কথা অমান্য করা চলবে না, বাবাও আনব বলে এসেছেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

সরমা চোখ বড় বড় করে বলে,—ও মাগো! তারপর?

—তারপর কি আর করবেন, টগর গাছটির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে চোখ বুজে এক মনে নাম করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, বাবার খেয়াল ছিল না। অনেকক্ষণ বাদে চোখ মেলে দেখেন পাঁচ ছটি ফুল ফুটে আছে।

—বলো কি গো?

—হ্যাঁ, ও যে সিদ্ধ টগর। এই বছর চার হল টগর গাছটি দেহ রেখেছে। অনেক বয়েস হয়েছিল ওর। প্রায় বাবার বয়েসী।

সরমার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর খোকা।

খোকাকে আদর করতে করতে বলে সরমা,—এ-ও দাদুর মতো হবে নিশ্চয়।

—হবেই তো। গোঁসাইয়ের কৃপা থাকলে হবে।

—আচ্ছা, গোঁসাই কি আর আসবেন না?

—কি করে জানব? এই তো বছর দেড়েক আগে এসেছিলেন এক শিষ্য। দাদার সঙ্গে দেখা করে একটি পট্টডোর দিলেন। গোবিন্দজীর প্রসাদী মালা, দেখো নি?

—না তো।

—ঠাকুরঘরের বাক্সে আছে।

—তোমায় কিছু দেন নি?

—না। সেবার অধিকার দিয়েছিলেন যে কদিন ছিলেন।

—আমার খুব ইচ্ছে গোঁসাইয়ের কাছে একবার যাই।

মঞ্জরী হাসে,—কেন গো?

—কানে নাম দেন যদি কৃপা করে।

মঞ্জরীর ভারি বিশ্বাস, বলে শান্তস্বরে,—সময় হলেই আসবেন। তাড়াহুড়ো করতে নেই।

সরমা হঠাৎ বলে,—গোসাইকে খুব ডাকো না, যাতে তোমার বেশ টুকটুকে একটি বর আসে!

মঞ্জরীও গম্ভীর হয়,—কাউকে বলবে না বলো?

—না।

—খুব কেঁদেছিলাম বাবার দেহ রাখবার পরে। আমার আশ্রয়ের জন্যে ডেকেছিলাম গোসাইকে।

—কি বললেন?

—স্বপ্নে বললেন।

—কি? বুক ঢিপ ঢিপ করে সরমার, কৌতূহলের উত্তেজনায়।

—বললেন।

—কি? তাড়াতাড়ি বলো না?

সবুর সইছে না সরমার।

চোখ দুটো ভিজে উঠেছে রূপমঞ্জরীর।

ফিসফিস করে বলে,—বললেন, অত ভাবিস নি, তোর মনের মানুষ এল বলে।

সরমা বলে,—কবে আসবে বলেছে?

—খুব শিগ্‌গির।

—তবে বোধহয়—। বলেই থেমে যায় সরমা।

—কি?

—বলব?

—বলো না?

—তবে বোধহয় ওই গানের ওস্তাদ আনন্দলাল।

রূপমঞ্জরী,—দূর! ও কখনও হয়?

—কেন? হবে না কেন শুনি? কি সুন্দর মুখখানি! কি গান!

—ধুস্ !—রূপমঞ্জরী খিলখিল করে হেসে ওঠে,—তোমার কি মাথায় গোলমাল হল ?

—কেন ?

—ও লোকটা ভালো নয়।

—বললেই হল। তুমি কি করে জানলে ?

—ওর চোখের তাকানি ভালো নয়, চোখই তো মনের খবর বলে গো !

—ও সব তোমার ভুলও হতে পারে।

—তা হতে পারে। কিন্তু এ সে নয়। সে এলে আমি বুঝতে পারব।

—ছাই পারবে। আচ্ছা ওই ওস্তাদের কি বিয়ে হয়েছে ?

—আমি কি করে জানব।

আপন মনেই বলে সরমা,—না, বিয়ে হয় নি। তোমার দাদা বলেছিল ও মেসে থাকে। একা। যাই বলো বাপু। আমার কথাটা ফ্যালনা নয়।

রূপমঞ্জরী হাসে,—সেরেছে, তুমি দেখছি আমার বর ঠিক করে ফেললে ?

সরমা হাসে,—হলে তোমার ভাগ্যি ! কি গান ! কানে যেন বাজছে এখনও। ওরা কি জাত জিজ্ঞেস করব তোমার দাদাকে।

—যা খুশি করো গে যাও,—মঞ্জরী উঠে যায়।

সজনে গাছের নীচে সূর্য নেমে গেছে, এবার গা ধুতে যেতে হবে। গামছা শাড়ি আর একটি কলসী নিয়ে এল মঞ্জরী। মনটা ওর কেমন বিস্বাদ লাগে। সরমা আনন্দলালের সঙ্গে তার ভাবী সম্পর্কের এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছে, এটা ও মনে মনে কোনমতেই গ্রহণ করতে পারে না। সত্যাই কি তার স্বপ্নের মানুষ আনন্দলাল ? মন সায় দেয় না। গুন গুন করে গান ধরে মঞ্জরী। ভাবতে ভালো লাগে না, বেশী ভাবতে একেবারেই ভালো লাগে না। গোঁসাই যা করেন তাই হবে, তাই মেনে নেবে মঞ্জরী। তবু নিজের মন দিয়ে বিচার করে মনে হয় আনন্দলাল গভীর নয়। ওর চাউনি ভাসা-ভাসা। অন্তরের ছোঁয়া পায় না, ভেতরে পৌছায় না। মনে হয় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে রাধাকুঞ্জে এসে কৃষ্ণ যেমন

অভিনয় করেছিলেন, এ যেন তেমনি এক অভিনয়ের মানুষ। আনন্দলালের কথা তাই অন্তর ছোঁয় না। মঞ্জরীর চোখে আনন্দলাল ধরা পড়ে গেছে।

মঞ্জরী ঘাটে এসে দেখে লাবণ্য এসেছে। লাবণ্যের সঙ্গে ও কথা কয় না। লাবণ্যও কইত না। লাবণ্যর বিয়ে হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। বিয়েতে সরমা গিয়েছিল, কিন্তু মঞ্জরী যায় নি। অনেকে ভেবেছিল অত বয়সে আইবুড়ী লজ্জায় আসে নি বোধহয়। লজ্জা ওর হয়েছিল সত্যি, কিন্তু আইবুড়ী থাকবার জন্যে নয়। এতদিন কথা না বলে লাবণ্যর সামনে যেতে লজ্জা হয়েছিল।

আজও শাড়িখানা ঘাটের ওপর রেখে গামছা-কলসী নিয়ে পুকুরে নামে। মুখ তুলে তাকায় না লাবণ্যর দিকে। লাবণ্য নতুনগড়া ঝকঝকে চুড়ির আওয়াজ তুলে ওর পাশে গিয়ে পুকুরে নামে।

লাবণ্য হঠাৎ কথা বলে আজ,—বিয়েতে গেলি না কেন?

মঞ্জরী তাকায় ওর দিকে। বিয়ের পরে বেশ ফরসা হয়েছে লাবণ্য, আর বেশ সুন্দরী। ওর চাউনিটাও আনন্দে উজ্জ্বল।

বলে,—শরীরটা ভালো ছিল না।

কতকাল পরে দুটো কথা হয় দুজনের।

লাবণ্য আবার বলে, —ও কিন্তু তোর কথা শুনে তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে।

মঞ্জরী একটু হাসে। প্রায় বাধ্য হয়ে বলে, —আসিস না তোর বরকে নিয়ে কাল বিকেলে।

—কাল সকালেই যে চলে যাব।

—কোথায়?

—ওর সঙ্গে।

অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ি। মনে হল সেদিনের কথা, যেদিন বলেছিল লাবণ্য চলে যাবে অনেক দূরে।

হাসি পায় মঞ্জরীর।

লাবণ্যই বলে,—তাই বলে তোর বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে ভুলিস নি যেন!

মঞ্জরী হাসে,—আমার বিয়ে! হলে বলব। তোর শ্বশুরবাড়ি তো কলকাতায়?

লাবণ্য বলে,—হ্যাঁ ভাই। একদম ভালো লাগে না। ওইটুকু ঘরের ভেতর দিনরাত্তির থাকা।

মঞ্জরী ভাবে তাকেও হয়তো কলকাতায় যেতে হতে পারে যদি আনন্দলাল সত্যিই তার স্বামী হয়। জিজ্ঞেস করে,—খুব ছোট ছোট ঘর বুঝি?

—আর বলিসনি। বিকেলে কলের জলে গা ধোয়া। গা ঘিনঘিন করে, মাগো! তবে হ্যাঁ, হপ্তায় হপ্তায় বায়স্কোপ দেখো। বেড়াতে বেরোও, কোনদিন আলিপুরে, কোনদিন পরেশনাথের মন্দিরে। থিয়েটার যাও, জলসায় যাও, একেবারে ছড়াছড়ি।

মঞ্জরী কখনও কলকাতা দেখে নি। ওর একটু অবাক লাগে কথাগুলো শুনে। বায়স্কোপ অবিশ্যি মঞ্জরী দেখেছে দুবার। দাদা নিয়ে গিয়েছিল স্টেশনের ধারে। ভালো মনেই নেই—কি দেখেছিল। বাঘভালুকের সব ছবি। হিন্দী কথা। বোঝে নি ভালো করে।

কলকাতার বায়স্কোপ নিশ্চয়ই আরও অনেক ভালো। দাদাকে বলবে আর-একবার বৌদিকে আর ওকে নিয়ে বায়স্কোপে যেতে। দাদা তো মাঝে মাঝেই দেখে। এসে গল্প করে।

লাবণ্য গল্প শুরু করে কলকাতার। তার ননদ ইস্কুলে পড়ে। তার কি স্টাইল। রোজ মুখে পাউডার না ঘসতে পেলে রক্ষে নেই। আর তেমনি দেওর। বৌদি-অন্ত প্রাণ। চাকরি করে। মাঝে মাঝেই বৌদির জন্যে আনবে এটা ওটা। সেদিন নিয়ে এল বাসন্তী রঙের একটা ব্লাউজ। আবার দুদিন পরে একবাক্স বিস্কুট, কোনদিন বা মুক্তোর মালা একছড়া। অবিশ্যি নকল মুক্তো।

—তাই নাকি?—বলতে হয় মঞ্জরীকে।

শুধু কি এই! পিসশ্বশুর মস্ত বড়লোক। নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। কি বাড়ি! মুখ দেখা যায়। আয়নার মত চক্চকে। এক মেয়ে ডাক্তারি পড়ে, আর এক মেয়ে বিলেতে। সব চেয়ার-টেবিলে ভাত খায়। কি ঘেন্না ভাই! গয়না বলতে ওরা কিন্তু কিছুই পরে না। হয়তো দুটো হীরের দুল। দাম দু হাজার টাকা। উঃ! যেন হীরে দুখানা ঘর আলো করে দিয়েছে! আর ছোট্ট ঘড়ি হাতে। মেয়েরা বরের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলে!

—তাই নাকি?—আবার বলতে হয় মঞ্জরীকে।

আর ওঁর আপিসের বড় সায়েব। তিনি তো ওঁকে ছাড়া জানেন না। যা কিছু করবে সব—মিস্টার দাস। সায়েব আবার ওঁকে দাস বলে ডাকে কিনা! আমার বৌভাতে এলেন। একখানা শাড়ি দিলেন। শাড়িখানার কী রঙ ভাই। ফিকে বাদামী। পাড় নেই। পড়তে কেমন লজ্জা লাগে, পাড় নেই কিনা? উনি বলেন, এই আজকাল স্টাইল!

তবে তো খুব সুখে আছে লাবণ্য! মনে মনে না ভেবে পারে না মঞ্জরী। লাবণ্যর কথার ঝকমকিতে চমক লেগে গেছে মঞ্জরীর।

লাবণ্য আরও অনেক কথা বলত, কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে আসে। লাবণ্য চলে যায়। মঞ্জরীও ফিরে আসে। লাবণ্যর কথাগুলো মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। হীরে দুখানা দু-হাজার টাকা। বরের সঙ্গে ইরেজীতে কথা বলে। বাসন্তী রঙের ব্লাউজ। রোজ পাউডার মাখা। নোতুন জীবনের আস্বাদ! কি অদ্ভুত!

আনন্দলালও কিন্তু জামাটা পরেছিল চমৎকার। সাদা দুধের মতো রঙ। ঝলমল করছিল। সিল্ক নিশ্চয়ই। আর জুতো-জোড়া? অমন চটি জুতো কখনও দেখে নি মঞ্জরী। কলকাতার সবই যেন ঝকমকে। এমন মেটে-মেটে নয়।

ঠাকুরঘরে প্রদীপ দিতে হয়। ধুনো দেয়। বৈকালী দিতে হয়। গোসাইয়ের পাদুকার সামনে বসে খঞ্জনীজোড়া নিয়ে বসতে হয়। নাম গান শুরু করতে হয়। চঞ্চল মনে আজ নাম গভীর হয়ে ওঠে না। ভাব-

শুদ্ধিতে বিঘ্ন হয়। নিজের কানেই যেন নিষ্প্রাণ মনে হয় নামকীর্তন। তবু নিয়ম রক্ষা করতে হয়। ওঠে মঞ্জরী।

রান্নাঘরে গিয়ে বৌদির পাশে বসে। তাও কেমন ভালো লাগে না। রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসে একা একা। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন গ্রামটা যেন মনের ওপর বোঝার মতো চেপে বসেছে মনে হয়। এ থেকে কি মুক্তি নেই? এমনি করে আর কতকাল কাটাব? প্রতীক্ষার কি শেষ হতে নেই প্রভু? রূপমঞ্জরীর চোখদুটো জলে ভরে ওঠে।

৩

এক পয়সাও পকেটে নেই আনন্দলালের। ছাত্রদের কাছে হাত পাতবার উপায়ও আর নেই। এমন অবস্থা ওর মাঝে মাঝে হয়। তখন মেসেও খেতে পায় না। থাকবার স্থানটুকু মাত্র বজায় থাকে মেসে। তাও যখন যাবার উপক্রম হয়, তখন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় মাঝে মাঝে আনন্দলাল।

পকেট থেকে বিড়ি বার করে টানতে টানতে চলেছে আনন্দলাল। একটা পার্কে বসে ছিল দুপুরটা। বিকেল না হলে তাকে পাওয়া যাবে না। বিকেলেই যেতে হবে। সন্ধ্যার কিছু আগে। সন্ধ্যেবেলা সে না থাকতেও পারে।

গোটা নয়েক বিড়ি শেষ করে ওঠে আনন্দলাল। কিছু দূরে একটি অপ্রশস্ত রাস্তায় ঢোকে। অবিন্যস্ত চুলের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নেয়। চটিটা টেনে টেনে চলতে থাকে। একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় আনন্দলাল। দরজায় চোখ বোলায়। দরজার ওপর একটি কাঠের ফলকে লেখা--অধ্যাপিকা উমা মল্লিক, এম এ.।

আনন্দলাল একটা বিড়ি বার করে ধরায়। দোরে টোকা দেয়। ডাকবার বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজায় না, কড়াও নাড়ে না। আবার আঙুল দিয়ে টোকা দেয়।

যে দরজায় টোকা দিচ্ছিল, সেটা না খুলে ডানদিকের সরু দরজাটা খুলে যায়। আনন্দলাল তাকায়। বিড়িটা টানে। ধোঁয়া ছাড়ে একমুখ।

একটি মার্জিতা নারীর মুখ দেখা যায়। ইশারায় ডাকে মহিলাটি। কাছে যায় আনন্দলাল। চোখ দুটোয় বিরক্তি ভরা মহিলাটির। সাদা শাড়ি পরনে। হাতে দুগাছা মোটা বালা। পায়ে লাল চটি। ছিমছাম পরিষ্কার। গলার স্বরটি বাঁশির মতো। তবু একটু কর্কশ মনে হয় এখন। ফিসফিস করে বলে,—আবার এসেছ ?

আনন্দলাল হাসে নিতান্ত নির্লজ্জের মতো।

—ঘরে দুজন ছাত্রী রয়েছে। একজন প্রফেসর রয়েছেন। এখন যাও।

আনন্দলাল মাথার চুল পাকাতে থাকে। একটা চুল ছিঁড়ে ফেলে অনর্থক। কিন্তু যায় না।

—আজ যাও।

আনন্দলাল হাসে। চোখমুখ ভাবলেশহীন,—বলে,—কিছু টাকা দিতে পারো ?

মহিলাটির তিক্ত কণ্ঠ শোনা যায়,—টাকা! টাকা! টাকার দরকার পড়লেই এই দরজায়। আনন্দলালের দিকে তাকায় ভালো করে মহিলাটি।

—কিছু খাওয়া হয় নি নিশ্চয়ই!

—না।—নির্বিকার কণ্ঠ আনন্দলালের।

মহিলাটি স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে আনন্দলালের দিকে। একটু মমতার আভাস দেখা যায় চোখে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। তারপরই আবার কঠিন হয়ে আসে ওষ্ঠপ্রান্ত।

বলে,—আজ কিছু হবে না।

আনন্দলাল বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তবু দাঁড়িয়ে থাকে। চলে যায় না।

মহিলাটি বিষাক্ত দৃষ্টিতে ওকে বেঁধে,—জীবনেও কি আমায় রেহাই দেবে না ?

বৃথা বিক্ষোভ। আনন্দলাল একটু চুপ করে থেকে বলে,—কয়েকটা টাকা পেলে আপাতত রেহাই পাব! তাছাড়া তোমার জীবন এখনও আছে। আমার কিন্তু নেই। মরে আছি।

—মরলেও বাঁচতাম।—মুখখানা উঁচু করে সে ঘৃণায়।

আনন্দলাল হাসে,—অপরূপ দেখাচ্ছে তোমায়।

মহিলাটি দ্রুতপায়ে বাড়ির ভেতর ঢোকে।

আনন্দলাল চলে যায় না। ও জানে, সে আবার আসবে। আবার ওমনি ঘৃণায় অপূর্ব ভঙ্গীতে তাকাবে। চোখে বিচ্ছুরিত হবে অহংকার। যৌবনের মত্ত দম্ভ। কামনায় ভরা যৌবনের ভারে মদমত্তা ও। উমা মল্লিক। সিঁথিতে সিঁদুরবিহীনা—অধ্যাপিকা। অনেক পুরুষের কামনার কেন্দ্র উমা মল্লিক।

বেশ আছে। আনন্দলাল হাসে। পরমুহূর্তেই সন্দেহ হয়। সত্যিই কি ভালো আছে? ভালো থাকা তো ওর স্বভাব নয়। ও তো সহজ নয়। মনের কতকগুলো কৃত্রিম আবেগে ভরে আছে। ও তাকায় বেঁকিয়ে, কথা বলে মেপে, হাঁটে গুনে গুনে। কি করে ভালো থাকবে ও?

আনন্দলাল আর-একটা বিড়ি বার করতে যায়। এর ভেতর এসে পড়ে উমা মল্লিক। হাতে ঝোলানো থলের ভেতর থেকে বার করে কয়েকখানা দশ টাকার নোট। বোধ হয় পাঁচ-ছখানা। ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়। আনন্দলাল তৎক্ষণাৎ নোট কখানা কুড়িয়ে পকেটে রাখে। মুখটা তুলে একটু হাসে।

উমা মল্লিকের চোখে সেই বিষাক্ত ঘৃণা। হয়তো বা একটুখানি কৃপা। একটু সময় তাকিয়ে থাকে ও আনন্দলালের চোখে চোখ রেখে। সেই সম্রাজ্ঞীর মতো উদ্ধত অমুক্ত গর্বের চাউনি। আনন্দলাল একটুও চমকায় না। একটুও কাঁপে না। মনে মনে হাসে। হাসির আভাস এসে পড়ে চোখে। যেন একটু রঙ্গ করবার জন্যেই বলে,—ভালো আছ তো?

এতক্ষণে কুশল সংবাদ। আশ্চর্য আনন্দলাল!

উমা মল্লিক জ্বলে। তিক্ত কণ্ঠে বলে,—লজ্জা তোমার একেবারেই গেছে।

বিড়িটা ধরায় আনন্দলাল,—বলে,—কোন কালে তো ছিল না!

—ছিল। যেদিন বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলাম, সেদিনও ছিল।

—কবে বার করে দিলে, ঠিক মনে নেই তো!

জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলোও মনে থাকে না আনন্দলালের।

আনন্দলাল মানুষ কিনা সন্দেহ হয়।

বলে অধ্যাপিকা উমা,—এত বেশী মনে আছে যে কথাটা স্বীকার করতেও চাইছ না।

আনন্দলাল হাসতে থাকে,—তা যদি ভাবো তবে তাই। কিন্তু সত্যি ভালো মনে পড়ে না।

—সবাইকে ভুলতে পারলেও আমাকে এত সহজে ভুলতে পারবে না।

—তা যা বলেছ। এমন দাতা জীবনে মেলে নি। আজকের দানও চিরকাল স্মরণের মতো।

শুধুই টাকা!—হতাশ হয়ে বলে উমা। লোকটার সঙ্গে রাগ করতেও পারা যায় না বেশীক্ষণ। খোঁচাগুলো এত তীক্ষ্ণ যে ভেঙে পড়তে হয়।

—আর কিছু তো—!

—তুমি যে পশুরও নীচে।

—তারও নীচে বোধ হয় কিছু মনে পড়ছে না?—স্বচ্ছন্দে বলে আনন্দলাল।

—যাও। আর কখনও এসো না।

—আবার আসব।

—ভালো। একটু দয়াও আর পাবে না।

—মুখে তো বরাবরই বল। কিন্তু পার কই?

—এবার পারব। ঠিক পারব।

—পারবে না। কেন তা তুমি নিজেও জানো না।

—তোমার মুখ দেখলে ঘৃণা হয়।

—বেশী দিন না দেখলেও তো মেসে লোক পাঠাও।

—ছাই ! সে তোমার কাছ থেকে টাকাগুলো আদায় করা যায় কিনা দেখবার জন্মে।

আনন্দলাল গম্ভীর হয়,—মিথ্যে বোলো না উমা !

—মিথ্যে ! যেন ধরা পড়ে গেছে উমা মল্লিক।

কঠোরা রূপবতী অধ্যাপিকার মনে কোনও এক অজ্ঞাত ক্ষত দেখা গেছে বুঝি !

ওঘরে জুতোর আওয়াজ শোনা যায়।

—আর কখনো এসো না। অনুরোধ করছি এসো না।—বলে মুহূর্তে চলে যায় উমা ভেতরে।

নেভা বিড়িটা দুবার টানবার চেষ্টা করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আনন্দলাল। নোটগুলো পকেটে ভালো করে ভাঁজ করে রাখে। বেরিয়ে আসে এবার।

কিছু টাকা পাওয়া গেছে। জীবনে আরও কয়েকটা দিনের জন্মে নিশ্চিন্ত।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে রাস্তা দিয়ে চলে ও।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সূর্যের আরক্তিম আভা ঢাকা পড়ে গেছে উঁচু অট্টালিকার আড়ালে। কালচে অন্ধকার নেমে আসছে কলকাতার বুকে। চোখের পিপাসা মেটে না। শশিনাথের গ্রামের সেই অপরূপ আকাশের কথা মনে পড়ে আনন্দলালের। ও আর-একবার যাবে সেখানে।

চোখের পিপাসা ওখানেও মেটে না আকণ্ঠ পান করেও।

আনন্দলাল দ্রুত পা চালায়। আজ শশিনাথ আসবে গান শিখতে ওর দোকানের সওদা সেরে। শশিনাথকে দেখতেও ভালো লাগে ওর। রূপমঞ্জরীর নয়নপল্লবের ঘন ছায়া, ওই গ্রামের ঠাণ্ডা শীতল ছায়া মনটাকে প্রখর ভাবসাবল্যের জ্বালা থেকে বাঁচায়। শশিনাথের ভেতরে সেই ছায়া দেখতে পায়, অনুভব করতে পায়।

আজকের জ্বালাটাও কম নয়। উমা মল্লিকের ঊষর তীব্রতা। শশিনাথকে দেখলেই হয়তো বা শান্ত হবে। তাও যদি না হয় ! কোহলের উগ্রতায় ঢাকতে হবে আজকের উগ্র জ্বালাকে।

আনন্দলাল মেসে এসে পৌছোয়।

৪

শীত পড়েছে এবার খুব। কার্তিকের মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস ক্রমে উত্তরের হিমপ্রবাহের সঙ্গে মিলে কাঁপিয়ে তুলেছে সমস্ত গ্রামটাকে। কুয়াশার ঘন আস্তরণ পাতলা হতে হতে সূর্য ওঠে গ্রামসীমানার অনেকটা ওপরে। সূর্য দেখা দেবার আগেই রূপমঞ্জরী ওঠে। গরম খসখসে গায়ের চাদরখানা জড়িয়ে নেয় গায়ে। ঠাকুরঘর ধোয়া মোছা শেষ করে ও যখন বেরোয় তখন সজনে গাছের ডালে বসে দু-একটা কাক ডাকতে থাকে। সরমা শশিনাথ ওঠে তারপরে। রূপমঞ্জরী স্নান সেরে এসে পুজোর ঘরে ঢুকলে সরমা রান্নার জোগাড় করতে থাকে। রূপমঞ্জরী ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে শশিনাথকে জলখাবার দেয়। মুড়ি-গুড়। অথবা চিড়া, নারকেল কুঁড়িয়ে। শশিনাথ বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে দোকানে। এতক্ষণে সূর্য দেখা যায়। কুয়াশা পাতলা হয়ে আসে।

সেদিনও রূপমঞ্জরী সন্ত স্নান সেরে এসে ঠাকুরঘরের পুজো সেরে বেরিয়েছে। শশিনাথ বসে আছে দাওয়ায় খোকাকে কোলে নিয়ে। গায়ে ওর কাঁথাখানা জড়ানো। বাইরে থেকে এক সুমিষ্ট স্বর কানে ভেসে আসে,—রাধে! রাধে!

শশিনাথ সোজা হয়ে বসে।

—জয় রাধে!

রূপমঞ্জরী চমকে ওঠে। ওর গায়ে একটু শিহরণ লাগে।

তখনও সূর্য ওঠে নি। পাতলা কুয়াশার পর্দায় ঢাকা গ্রামখানি।

রূপমঞ্জরী এগিয়ে যায়।

একটি পুরুষ এগিয়ে আসে। সুউচ্চ সুঠাম দেহখানি। গেরুয়া মোটা চাদরে গা ঢাকা। গেরুয়া রঙে ছোপানো একটি থলে হাতে। কোঁকড়া ঘনকালো চুল কাঁধ অবধি লম্বা।

শশিনাথ উঠে দাঁড়ায়।

রূপমঞ্জরী তাকায়। আবার চোখ নামিয়ে নেয়।

পদ্মকর্ণিকার মতো টানা টানা চোখ। স্বচ্ছ দীঘির জলে ভাসা-ভাসা।

একটু হেসে বলে সে,—বৃন্দাবন থেকে এসেছি। অবশ্য কয়েক জায়গায় ঘুরে।

রূপমঞ্জরী তাকায়।

শশিনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

—গোসাইয়ের কুঁড়েতেই ছিলাম কাল রাতটা। সন্ধ্যের ট্রেনে এসেছিলাম।

এই হাড়কাঁপা শীতে ওই পোড়ো কুঁড়েঘরে!

অবাক হয় মঞ্জরী।

শশিনাথ ব্যথিত হয়—এখানে এলে তো পারতেন।

স্নিগ্ধ হেসে বলে সাধু বাবাজী—রাত তো ভালোই কাটল গোঁসায়ের কৃপায়। গোঁসাই আপনার কথা বলেছিলেন তাই এলাম।

শশিনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় আবার।

—বললেই চিনবেন। প্রভুপাদ শ্রীগৌরদাস গোঁস্বামীর বৃন্দাবনের আশ্রম।

শশিনাথ নীচু হয়ে প্রণাম করে।

রূপমঞ্জরী আরও নীচু হয়ে প্রণাম করে।

প্রতিবারেই হাতজোড় করে প্রতিপ্রণাম জানায় সাধুটি। ওদের অন্তরের কৃষ্ণকে প্রণাম জানায়।

রূপমঞ্জরা ভেতরে গিয়ে একখানা আসন এনে বসতে দেয়।

শশিনাথ বলে একান্ত বিনয়ে—অপরাধী করলেন আমাদের।

—না, না, অপরাধ কিসের?

—বারে, আমরাও তো গোঁসায়ের আশ্রয়ে আছি। আপনি আমাদের আপন জন।

রূপমঞ্জরী তাকায় ভালো করে। আপন জন!

—আপন জনই তো! সবাই আমরা কৃষ্ণদাস। খুব আপন।

বড় আস্তে আস্তে কথা বলে অল্পবয়সী সাধুটি।

সরমা এসে প্রণাম করে। খোকাও।

বড় মিষ্টি আর নম্র গলার স্বর।

শশিনাথ আবার বলে,—আপনি কেন কাল এলেন না? ও কুঁড়ের তো চাল নেই, দেয়াল ভাঙা, সাপ থাকতেও পারত।

—থাকলে আর কি করা যেত।

—গোঁসাই এখানে কেন পাঠালেন আপনাকে?

—গোঁসাইয়ের ভিটেতে একটু ভজনা করব। এ ভিটে মন্ত্রসিদ্ধ।

—কিন্তু থাকবেন কি করে। চাল নেই।

—করে নেয়া যাবে। খড়কুটো কিছু জুটবে নাকি?

শশিনাথ বোঝে কিনা কে জানে, কিন্তু মঞ্জরী বোঝে গুরুর ভিটেয় বসে সাধন করতে চান ইনি। মঞ্জরীর বুকের ভেতরটা কাঁপছে তখন থেকে। কি শান্ত তেজ মুখখানির ভেতর!

ব্রহ্মচারী বলে আবার,—মাসখানেকের ভেতর বোধ হয় হয়ে যাবে।

শশিনাথ বলে,—না, না, দিন পাঁচেক লাগবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দোব। আপনি এ কদিন এখানে থাকুন।

মধুর হেসে বলে ব্রহ্মচারী,—তা তো হবার জো নেই!

—কেন?

রূপমঞ্জরী বলে ফেলে,—উনি গৃহীর বাড়িতে থাকতে চান না।

মনের কথা টেনে বলেছে।

ব্রহ্মচারী তাকায় মঞ্জরীর দিকে। পরম বুদ্ধিমতী মেয়েটি।

শশিনাথ মাথা চুলকোয়,—তবে কি করা যায়! বড় বিপদ হল।

মঞ্জরী বলে আবার,—সিধে পাঠিয়ে দোব, আর ঘরের ওপরে একটা চাদর বেঁধে দাও এখন। আমি গিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে আসছি।

—তাই বরং কর। তুই একবার যা।—শশিনাথ যেন ভরসা পায়।

সাধুটি তাকায় রূপমঞ্জরীর দিকে—অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি সব করে নেব।

রূপমঞ্জরী মনে মনে হাসে, করতে দিলে তো!

বলে ব্রহ্মচারী,—যে কথা বলতে এসেছিলাম। মাঘীপূর্ণিমায় অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন হলে বড় আনন্দ হত। আপনাদের কৃপা না হলে তো আমার সাধ্য নেই।

--তা হবে। নিশ্চয়ই হবে। —শশিনাথ তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ে।

এতদিন পরে আবার একটা বেশ বড় রকমের উৎসব করা যাবে।

—এখন থেকেই চেষ্টায় থাকতে হবে। —বলে শশিনাথ।

--চেষ্টাই আমরা করতে পারি। তারপর গোসাইয়ের কৃপা। ভক্তদের কৃপা। তা হলে আমি আসি।

—তাহলে আপনার সিধেটা পাঠিয়ে দোব।

সাধু হাসে,—না, না, পাঁচ ঘরের মাধুকরীতে বেশ চলে যাবে। আমার নামটা জেনে রাখা ভালো—নীলকেশর। আপনার নাম আমি জানি। আপনার পিতাঠাকুর আমার গুরুভাই।

শশিনাথ প্রণাম করে,--আশীর্বাদ করুন আমিও যেন গোসাইয়ের পায়ে আশ্রয় পাই।

আবার প্রতিপ্রণাম করে নীলকেশর।

তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

ছোট পুকুরটি পেরিয়ে এলে কুঁড়ে ঘরখানি। তার পাশে কলাবাগান। কালোজাম গাছ। উদ্ধত বিরাট গাছটির ছায়া এসে পড়ে কুঁড়ের ওপর বাঁকা হয়ে। নীলকেশর সোজা চলে আসে সেই ভিটেতে। উন্মুক্ত ঘর। আকাশের ছাউনি। একদিকের দেয়াল ভাঙা।

এসে একটা দেয়ালে পিঠটা রেখে বসে নীলকেশর। গুরুপরিত্যক্ত গৃহে সাধন করতেই এসেছে সে। আমৃত্যু সাধন—অথবা কৃষ্ণকৃপা লাভ। এবেলাটা কেটে যাক এভাবেই। বিকেলে বেরুবে মাধুকরী পরিক্রমায়।

থলেটা রেখে ওঠে নীলকেশর। কিছু দূরে ঘাটে গিয়ে স্নান সেরে

আসে। গ্রামের সবাই দেখে একটি অল্পবয়েসী সাধু এসেছে গাঁয়ে। স্নান সেরে ফিরে আসে। থলে থেকে বার করে ছোট আয়নাটি আর তিলক মাটি। তিলক সাঙ্গ করে পূর্বদিকে মুখ করে বসে। চুপ করে বসে থাকে। আজ শুধু বসে থাকবে। খাওয়া-দাওয়ার কোন চেষ্টা করবে না। একান্ত নির্ভরতায় মনকে সেই পাদপদ্মে এলিয়ে দেয়। চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে।

অনেকক্ষণ বসে থাকে—নিশ্চিন্ত আনন্দে গুনগুন করে নাম গাইতে থাকে—এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রু ধার॥ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥

একটু উঠবেন ?

কোমল নারীকণ্ঠে চমকে ওঠে নীলকেশর।

একটু উঠুন মহারাজ।—মৃদু মৃদু হাসছে রূপমঞ্জরী।

নীলকেশর তখনো বিভোর। স্তিমিত চোখে তাকায়।

মঞ্জরী সিধের থালাটা নামায়। তাতে চাল, ডাল, কাঁচকলা দুটো, গোটাকয়েক আলু। নুন আর ঘি। একটা নোতুন হাঁড়িও।

—উঠুন।

—কেন ?—ভাবসংবরণ করে বলে নীলকেশর।

—কাল রাত্তিরে উপোস গেছে। আজ উপোস গেলে আর রক্ষা আছে। তাকিয়েছেন কি ভস্ম হয়ে যাব।

কৌতুকে হাসতে হাসতে বলে মঞ্জরী।

নীলকেশর গাম্ভীর্য বজায় রেখে শান্ত স্বরে বলে,—কোন দরকার নেই।

চোখ বড় বড় করে বলে মঞ্জরী,—তা বললে কি হয়, শেষকালে মরি আর কি!

নীলকেশর মঞ্জরীর দিকে ভালো করে তাকায়।

ওর দৃষ্টির গাম্ভীর্যে একটুও থমকে যায় না মঞ্জরী। আতিথেয়তার এক জন্মগত অধিকার আছে ওর। সে অধিকার ও জীবন গেলেও ছাড়তে পারে না।

বাড়িতে শশিনাথ যখন বললে,—উনি তো কিছুই নেবেন না। আজকের দিনটা না হয় যাক, কাল জন ডেকে ঘরের চাল তোলা যাবে। ওঁর খাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। যাই আজ আবার দেরি হয়ে গেল!

—যাবে কোথায়! বাড়ির পাশে সাধু অতিথি না খেয়ে পড়ে থাকবে! বলে সরমা।

শশিনাথ বলে,—বাঃ আমি কি করব বল! আজ আবার মাস কাবারের খদ্দেরদের হিসেব দিতে হবে। মাল গুনে দেখতে হবে। সওদায় কাল যাবার কথা। কাল না হয় পরশু যাব।

রূপমঞ্জরী কথা বলে না। চোখদুটো নীচু করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে।

শশিনাথ বেরিয়েই যায়।

রূপমঞ্জরী ঠাকুরঘরের কাজ সেরে রান্নার যোগান দিয়ে খোকাকে স্নান করিয়ে ভাত খাইয়ে সরমাকে বলে,—দাও না আমায় একটা সিদে ঠিক করে, দিয়ে আসি।

কাজ করতে করতে কেবলই ওর মনের ওপর ভেসে উঠেছে পদ্মকর্ণিকার মত চোখদুটো। কাউকে জানে না, কাউকে চেনে না। একা একা পড়ে থাকবে একটা খোলা ঘরে। এতক্ষণ হয়তো বসে বসে রোদে পুড়ছে! হয়তো খিদেও পেয়েছে, মাধুকরী এখানে সহজেই মিলবে, কিন্তু মানুষটিকে দেখে মনে হল নিজে রেঁধে খাবার মতো চোখস নয়। কেমন আলগা আলগা। সব এলিয়ে উজাড় করে দিয়ে বসে আছে। একান্ত নির্ভরতায় ভরা চোখের চাউনি। কোন কিছুর জন্যেই অহেতুক ব্যগ্রতা নেই। মানুষটা নিশ্চয়ই খেতে পাবে না আজ। মনটা কেমন-কেমন করে।

কাজ সেরে সরমাকে বলে সিধের কথা।

সরমার মনটা নরম হয়েছিল।

এককথায় একটি থালায় সিধে সাজিয়ে দেয় সরমা।

মঞ্জরী একটা নতুন হাঁড়ি বার করে নেয় ঘর থেকে। একটা দেশলাই, নিজের মোটা চাদরখানাও নিতে ভোলে না। সমস্ত দুপুরটা রোদে পুড়বে!

সব জোগাড় করে নিয়ে এসেছে সেবার অধিকার নিয়ে।

অত সহজে ফিরে যাবে না মঞ্জরী।

নীলকেশর হয়তো বা বোঝে। বোঝে এই হয়তো বা রাধারানীর অহেতুক কৃপা।

তবে তাই হোক।

ওঠে নীলকেশর।

—কই মাধুকরীতে গেলেন না?—জেনেশুনেও মুখ টিপে হেসে বলে রূপমঞ্জরী।

নীলকেশর সহজ হয়, বলে,—এক দোর থেকেই তো ভিক্ষে এল।

—না চাইতে।

—সত্যিই না চাইতে, আমি একবারও চাই নি।

—আপনি না চাইলেও তিনি যে আপনার কষ্ট সইতে পারবেন না।

নীলকেশর বিমুগ্ধ হয় রূপমঞ্জরীর কথায়।

এমন গভীর কথা এর মুখে কোথা থেকে এল।

—ভক্ত যে ভগবানের চেয়েও বড়। তিনি ভক্তের দাস। নয় কি?—মঞ্জরী হাত থেকে জিনিস নামায়।

নীলকেশরের কানে মধু ঢালে।

এত সহজ কথা সহজে বলা যায় না।

বানানো কথা নয়। শোনা নয়, প্রাণ থেকে বলছে মেয়েটি।

—তোমার নাম কি?

—রূপমঞ্জরী।

তুমি এত কথা জানলে কি করে?

—আপনাদের কৃপায়।

—বল তাঁর কৃপায়। আমি তো তোমার দাস।

—সত্যি বলছেন।—মঞ্জরী আবার হাসছে।

—রহস্য নয় তো?

নীলকেশর বলে,—সত্যি আমি সকলের দাসানুদাস।

—বানানো বিনয় নয় তো?

আর-একটা ধাক্কা খায় নীলকেশর।

রূপমঞ্জরী এত সহজ যে ওকে ধরতেই পারছে না নীলকেশর।

সত্যিই কি সে এত দীনতা আনতে পেরেছে মনে? এত বড় প্রশ্ন তো তার মনেও এর আগে কখনও জাগে নি। মেয়েটি একটি ঝাঁকানি দিল তাকে।

—নিন ধরুন তো চাদরের এপাশটা! একা পারছি না।

চাদরটা টাঙাতে চায় মঞ্জরী।

নীলকেশর আপত্তি জানায়,—কি দরকার ছিল।

—এই যে বললেন দাসানুদাস, যা বলছি করুন।—হাসে রূপমঞ্জরী। আনন্দে ভাসছে ওর মন।

নীলকেশরকে আবার চমকাতে হয়।

মনে মনে প্রণাম জানিয়ে রূপমঞ্জরীর কথাই শুনতে হয় তাকে।

চাদরটা কোনমতে চারকোণে বেঁধে দিয়ে মঞ্জরী চলে যায়।

নীলকেশর দাঁড়িয়ে থাকে।

আর প্রশ্ন নয়।

কিছু কাঠ কুড়িয়ে আনে মঞ্জরী। কিছু কলাগাছের শুকনো খোলাও।

একটা বাটি খালি করে নিয়ে বাটিটা দিয়ে কুঁড়ে কুঁড়ে মাটির মেঝেতে একটা ছোট গর্ত করে।

বলে—হাঁড়িটা করে একটু জল আনবেন?

নীলকেশর হাঁড়ি নিয়ে পাশের পুকুর থেকে জল নিয়ে আসে।

মঞ্জরী ততক্ষণে গর্তের ভেতর খড়কুটো জ্বেলে আগুন ধরায়।

—নিন, ভাত চাপান।

চালডাল ধুয়ে একসঙ্গে চড়িয়ে দেয় মঞ্জরী।

—আমার হাতে তো খেতে নেই আপনার ?

নীলকেশর শুধু বলে,—না।

—তবে নিজেই শুরু করুন। আমি একটু দাঁড়িয়ে দেখলেও দোষ হবে ?

—না।—তেমনি একটা জবাব নীলকেশরের।

মঞ্জরী দাঁড়িয়ে থাকে। চালডাল কাঁচকলা আলু সিদ্ধ করে নামিয়ে নেয় নীলকেশর।

থালার ওপর ঢেলে নেয়।

তেল-নুন দেয় মঞ্জরী।

খাওয়া সেরে হাত-মুখ ধুয়ে আসে নীলকেশর।

—এবার খুশী ?—বলে নীলকেশর।

মন ভরে ওঠে তৃপ্তিতে। গলায় আঁচল জড়িয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করে রূপমঞ্জরী।

প্রণাম করে অনেকক্ষণ।

প্রতি-নমস্কার করে নীলকেশর হাত জোড় করে।

মঞ্জরী যখন প্রণাম সেরে মুখ তোলে চোখ দুটো ওর ঘনপল্লবছায়ায় গভীর মনে হয়। একটু ভিজেও বা।

হাত জোড় করে বলে,—কিছু অপরাধ নেবেন না।

নীলকেশর কথা বলতে পারে না।

ভাবে বিভোর হয়ে ওঠে ওর স্বচ্ছ মন।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অনেক বেলা হয়েছে। দাদা ফিরবে হয়তো আর একটু সময়ের ভেতর। দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চলে আসে।

নীলকেশর বিভোর হয়ে বসে আছে।

হয়তো বা স্বয়ং রাধারানীর কৃপা।

আকণ্ঠ মধুপান করে বিহ্বল হয়ে পড়েছে নীলকেশর।

কৃষ্ণচিন্তায় ডুবে যেতে চাইছে।

৫

মুঠো মুঠো আলো ছড়িয়ে পড়েছে মনের আকাশে। রূপমঞ্জরী অধীরা হয়ে উঠেছে ভাবানন্দে। এত আলো! এত আনন্দ দুয়ার ভেঙে এসেছে অথৈ আলোর বন্যা।

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রূপমঞ্জরী। ওর চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছে অধীর প্রাণচঞ্চলতা। স্বপ্ন দেখছে রূপমঞ্জরী। কৃষ্ণামৃতপ্রবাহিনী যমুনার স্বপ্ন। এ স্বপ্ন দেখতে ও ভালবাসে। আঁচলখানা মুড়ে শুয়ে পড়েছে রাত্রে। চাদর নেই। চাদর বাঁধা আছে সেখানে। ভাবতে ভাবতেই ওর শীতবোধ থাকে না বেশী। বাঁ হাতখানা এলিয়ে রেখেছে কোমরের ওপর। পাশ ফিরে শুয়ে আছে—পা দুটি গুটিয়ে। পায়ের পাতা দুটো শাড়ির প্রান্ত টেনে ঢাকবার চেষ্টা করে। বৃথা। ঢাকা পড়ে না। রোজকার মত আজও স্বপ্ন দেখে। ধূ ধূ বালির চর। যমুনার কিনারায় কিছু সবুজ ঘাস এখানে ওখানে। কয়েকটি গাছ। তমাল তরুর সারি। কিছু দূরে কদম্বফুল দেখতে পায়, গোল কদম্ব ফুলে ভরা গাছটি। বিশ্রাম করছে সে। ছোট ছোট নরম পা দুখানি মেলে দিয়েছে ঘাসের ওপর। বাসন্তী রঙের পাতলা কাপড়খানি কোমরে আঁট করে বাঁধা। ঘাসফুলের মতো গায়ের রঙ। এবারে তাকাল।

এইখানেই অন্যদিন স্বপ্ন ফুরিয়ে যায়। আজ আর ফুরোতে চাইছে না। কয়েকটি দুধের মতো সাদা গোরু এপাশে ওপাশে। পরম আরামে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে ওরাও। ধ্যান করছে বুঝি? যমুনার গন্ধ পায় রূপমঞ্জরী। আর নরম ঘাসে ভরা মাটির গন্ধ, বিশ্রামের মধ্যেই আধশোয়া হয়ে পা দুখানি নাচায় সে। ছোট ছোট কচি দুটি পা। চন্দনের গন্ধে ভারী বাতাস, গন্ধ পায় রূপমঞ্জরী। চন্দনের স্নিগ্ধ সুবাস। সত্যি সত্যি। স্বপ্ন তবু ফুরোয় না। ঘুমও আসে না। নীলকেশরকে দেখতে পায় মঞ্জরী।

ঘাসফুলের মতো গায়ের রঙ হলদে হয়ে ওঠে। বাসন্তী রঙের কাপড় হয়ে যায় গেরুয়া। তেমনি করেই তাকায় নীলকেশর। তখনও চন্দনের গন্ধ। রূপমঞ্জরী বাতাসে মিশে যায় দেখতে দেখতে। নীলকেশরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রূপমঞ্জরী বাতাস হয়ে ঢেকে ফেলে ওকে।

ঘুমিয়ে পড়ে রূপমঞ্জরী। পরদিন ওঠে সেই ভোরে। শীত-শীত করে এবার। গায়ে আঁচল মুড়ে উঠে পড়ে। স্নান সেরে ঠাকুরঘরে যেতে হবে। গামছা নেয়, মাথায় তেল দেয়, একখানি শাড়ি হাতে নেয়।

যাবার পথে একটু ঘুরে গেলেই রাস্তায় পড়ে গোসাইয়ের ভিটে। একটু ঘুরে যেতে ইচ্ছে হয় ওর। না থাক। ঘুরে যাবে না, নিজের মনেই লজ্জা আসে। কেনই বা এত সেধে যেতে হবে! ভাবতে ভাবতে কলাবাগানের কাছে এসে পড়েছে ও।

কানে আসে বাতাসে ভাসা ক্ষীণ সুর। একটু এগোতেই হয় ওকে। অপূর্ব কণ্ঠস্বর। দুটো কান ভরে যায়। কান ইন্দ্রিয়টি মাত্র দুটো হল কেন? আপনা আপনি মনে হয় রূপমঞ্জরীর। দুটো কান পেতে থাকে একাগ্র হয়ে।

নীলকেশর পাঠ করছে। কি মধুর সুর করে পাঠ করছে।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপায় তব পদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

মন ভরে যায়। প্রাণ ভরে যায়। কথার কী মানে কে জানে। কথাগুলো কিন্তু অন্তরে একটি একটি করে ঘা দেয়। সুর তোলে। উচ্চারণের আর সুরের তরঙ্গ ভাববাহিত হয়ে ভাবে আঘাত করে। মঞ্জরীর মন টলমল করে। ছলছল করে চোখ।

আর দাঁড়াতে পারে না। নতজানু হয়ে প্রণাম করে।

তারপর আবার ঘাটের দিকে এগোয় দ্রুত পায়ে।

এক সের পাত্রে চার সের মধু ধরবে না। ভাব উপচে পড়ে ভাসাভাসি হবে। ভয় হয়, তাই দ্রুত পায়ে পালায় মঞ্জরী।

স্নানাদি সেরে ঠাকুরঘরে এসেও বার বার ওই সুরটি কণ্ঠে আসে।

অয়ি নন্দতনুজ! ওইটুকুই মাত্র মনে আছে। আর সবটা আছে প্রাণের অনেক গভীরে। তাই মনে পড়ছে না। ঠাকুরঘরে সেদিন অনেকক্ষণ কেটে যায়।

শশিনাথ আজ এবেলা আর দোকানে বেরুবে না। সাধুভাই নীলকেশরের থাকবার জায়গাটা ঠিক করে দিতেই হবে। সকাল থেকে গোঁসাইয়ের নাম করে নীলকেশরের আসবার কথা জানিয়ে, বিশেষ করে অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের কথা বলে খড় জোগাড় হয়, বাঁশ জোগাড় হয়। দরমা আসে, ঘরামী আসে বিনে পয়সায়।

—আশ্চর্য গোঁসাইয়ের দয়া। একটা পয়সা কেউ চাইলে না।

বলে শশিনাথ সরমাকে।

সরমা ছেলেকে খাওয়াচ্ছিল। বলে,—কালকের দিনরাত আমার মনটা বাপু সাধুর জন্যে বড় কেমন কেমন করছিল। আহা। এই শীতে কি কষ্ট বল তো?

শশিনাথ হাসে,—তুমি ছাই জান। আমার মন একটুও খারাপ হয় নি।

—সে কি গো!

— আমি জানি শীত ওদের লাগে না। ওরা যে বৈরাগী।

—বারে বা! বৈরাগীর শীত-গ্রীষ্ম নেই।

—না নেই। ওরা ওসব সইয়ে নেয়।

—তা কখনও হয়! ওসব তোমার পেট গরমের কথা।

—পেট গরম তোমার। না বিশ্বাস হয় জিজ্ঞেস কোরো সাধুভাইকে।

—যাই হোক বাপু। আজ যেন ঘর ঠিক হয়ে যায়।

—কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। এবার একবার দেখে আসি।

শশিনাথ ওঠে। কলাবাগানের ফাঁক দিয়ে দেখে লোক কাজে লেগে গেছে।

ঘরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে,—সাধুভাই কই?

একটি জন বলে, বোধ হয় বেরিয়েছে।

তবে বোধহয় মাধুকরীতে।

ভাবে শশিনাথ।

এরি ভেতর এসে পড়ে নীলকেশর।

স্নান সেরে এসেছে। গেরুয়া কাপড়খানি ভিজে। গায়েই শুকোবে।

কাপড়খানি এখানে ওখানে একটু ছিঁড়েও গেছে।

জামগাছের তলায় থলেটা নিয়ে বসে নীলকেশর।

তিলক করতে হবে।

শশিনাথ কাছে আসে।

নীলকেশর তাকায়। একটু হেসে বলে,—কি কাণ্ড বলুন তো। আমি নিজেই যা হোক চালার ব্যবস্থা করতে পারতুম।

শশিনাথ হাসে। বুদ্ধিমানের ভঙ্গীতে হেসে বলে,—সব কাজ কি সবাই পারে?

—যা হোক করে নিতুম।

—আবার ভেঙে পড়ত।—হাসে শশিনাথ,—এবার ভাঙলে আপনার মাথায়ই ভেঙে পড়ত।

নীলকেশর হাসে।

শশিনাথ শুধোয়,—আজ কিন্তু আমার বাড়ি থেকে সিদে আসবে। কাল কি সেবা করেছেন? নিশ্চয়ই কিছু জোটে নি?

নীলকেশর অবাক,—বারে! আপনিই তো ভিক্ষা পাঠালেন কাল!

—আমি?—শশিনাথও আকাশ থেকে পড়ে।

—এই চাদরখানাও তো ওপরে চাঁদোয়া করতে পাঠিয়েছিলেন।

থলে থেকে মোটা চাদরটি বার করে নীলকেশর। শশিনাথের হাতে দেয়,—নিয়ে যান।

শশিনাথ হতভম্ব হয়ে যায়। চাদরটি হাতে নিয়ে আর কথা বলতে পারে না। এমনিই শশিনাথ একটু সোজা মানুষ। কোন ব্যাপার তলিয়ে বুঝতে একটু সময় নেয়।

এ তো মঞ্জরীর চাদর!

—সেই তো এসেছিল!

শশিনাথ এতক্ষণে হাসতে পারে,—তাই বলুন! আমি ঠিক জানতুম না। দোকানে ছিলুম কিনা? আমার বাজারে একটা মনিহারী দোকান আছে। আপনার কৃপায় সব পাওয়া যায় সেখানে।

—তাই নাকি? ছোট আয়নাটি বার করে তিলক পরতে থাকে নীলকেশর।

আয়নাটা আপনার ঝাপসা হয়ে গেছে! দোবখন একটা আয়না দোকান থেকে এনে। সব কলকাতার মাল। খুব টেঁকসই অথচ সস্তা।

নীলকেশর হাসে,—বটে, তবে তো বেশ বড় দোকান!

—আপনাদের আশীর্বাদে খুব ছোট নয়। এখন দু হাজার টাকার মাল বার করে দিতে পারি এক কথায়। সবই আপনাদের আশীর্বাদ।

—গোসাঁইজী শুনলে খুব খুশী হবেন। আপনার পিতাঠাকুরকে খুব স্নেহ করতেন গোঁসাইজী।

—সেটা ওঁর কৃপা। বাবাও তো যেমন তেমন ছিল না। অত বড় ভক্ত বার করুন তো একটা আজকাল? আজকাল তো বেশীর ভাগই লোক-দেখানো!

—বটেই তো। বলে নীলকেশর,—ভক্তের সন্তান দেখেই বুঝতে পাচ্ছি! আপনিও কি কম!

মনে মনে ভাবে নীলকেশর— আর মেয়েটি! ওই রূপমঞ্জরী। ভক্তের সন্তান না হলে অমন কখনও হয়!

শশিনাথ একগাল হেসে হাত জোড় করে বলে,— কি যে বলেন! আমি তো বাবার পায়ের ধুলোর যোগ্যও হই নি! তবে হ্যাঁ, আপনাদের কৃপা পেলে সবই হতে পারে।

—এই তো এমন সুন্দর কথা বলছেন! যোগ্য নই বললেই হল?

নীলকেশর তিলক শেষ করে। কপালে, বুকে, পিঠে, হাতে, পাশে মন্ত্র স্মরণ করে তিলক ধারণ করে। মাঝে মাঝে কথা বলে শশিনাথের সঙ্গে।

শশিনাথ এবার ওঠে,—তাহলে মাঘী পূর্ণিমায় অষ্টপ্রহর হবে।

—তিনি যদি সব জুটিয়ে দেন তবে তো?

শশিনাথ বলে,—এখন থেকে বলে রাখি সবাইকে।

নীলকেশর বলে,—আমিও জানাব।

—সিদে তাহলে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—না, না, রোজ রোজ এক দোরের ভিক্ষে গ্রহণ! আমার তো' মধুকরের বৃত্তি। পাঁচ ফুলের মধু সঞ্চয়! মাধুকরীতে বেরোব আজ।

—আজ না হয় আমাদের গোবিন্দের প্রসাদ পেতেন। ঘর শেষ না হলে কোথায় রান্না হবে?

—কেন গাছতলায়। হাসে নীলকেশর।

—গৃহীর বাড়ি কি প্রসাদ গ্রহণ করতেও দোষ!

দু হাত জোড় করে নীলকেশর মাথায় ঠেকায়,—ছি, ছি, ও কথা বলবেন না। প্রসাদ গ্রহণ করতে পেলে নিজের সৌভাগ্য মনে করব।

—তবে ওই কথাই রইল। অন্ন ভোগ আমাদের রোজ হয় না। আজ ব্যবস্থা করছি। বলে শশিনাথ চলে আসে।

ঘরের কাজের তদারক করে কিছুক্ষণ। আজকের ভেতরই শেষ করতে হবে ঘরখানা। হয়ে যাবে। একটি ছোট চালা তুলতে আর কতক্ষণই বা লাগবে? দুপুরের ভেতরই শেষ হয়ে যাবে।

আবার ঘুরে নীলকেশরের কাছে আসে শশিনাথ,—আপনি বরং চলুন না আমাদের বাড়ি। ঠাকুরঘরে থাকবেন দুপুরটা। সেবা করে আসবেন এখানে বিকেলে।

নীলকেশর মৃদু হেসে বলে,—থাক না, বেশ তো আছি!

—এই রোদ্দুরে কষ্ট হবে!

—শীতের রোদ্দুর ভালোই লাগে। তাছাড়া গাছের ছায়া রয়েছে।

শশিনাথ প্রণাম করে, বলে,—আমি তাহলে চলি। একটু পরেই আসবেন।

নীলকেশর প্রতি-প্রণাম করতে ভোলে না।

বাড়ি এসে শশিনাথ সরমাকে ডাকে,—বলি শুনছ ? সাধুভাই এখানে সেবা করবেন।

রূপমঞ্জরী কুয়ো থেকে জল তুলছিল। তাকিয়ে ছিল পেঁপে গাছের ওপরে পাখিটির দিকে। এক-একটা বুনো পাখির কি সুন্দর রঙ। কাঁচা খয়েরের মতো পালকের রঙ,তার ওপর ছিটে ছিটে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে যেন কে। একটা আধ-পাকা পেঁপে ঠোকরাচ্ছিল পাখিটা। দড়িবাঁধা বালতিটা জলে ভরে ওঠাতে আর ইচ্ছে হয় না।

সবুজ বড় বড় পেঁপের ডগার আড়ালে পাখিটার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে যায় মঞ্জরী। এমন তন্ময়তা ওর মাঝে মাঝেই হয় আজকাল।

কাল একটা ছোট ধবধবে সাদা বাছুরকে দেখে ও অমন হয়ে গিয়েছিল, বাছুটার গা চাটছিল ওর মা—গাভী।

রোদ্দুর এসে পড়েছে বাছুরটার পিঠের ওপর। শীতের সকালে একটু রোদ্দুর পেয়ে ও পরম আরামে চোখ দুটো আধবোজা করে মুখটা একটু তুলে দিয়েছে।

ঝিকমিক করছে রোদ্দুর ওর মসৃণ পিঠের ওপর।

মঞ্জরী চাল ধুতে এসে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

সরমা কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে অবাক,—কিগো ভাব লাগল নাকি ?

মঞ্জরী হঠাৎ ডাকে চমকে ওঠে।

তারপর বলে,—দেখো বৌদি কি সুন্দর ! কেমন মায়ের গলার দিকে মুখখানা তুলে ধরেছে !

—এদিকে উনুন যে জ্বলে গেল। চাল ধুয়ে তারপর যত খুশি দেখো।

মঞ্জরী একটু লজ্জিত হয়।

আজও পাখিটার দিকে আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকত যদি না শশিনাথের কথাটা ওর কানে যেত,—সাধুভাই এখানে সেবা করবেন।

বুকের ভেতরে একটা ঢেউ খেলে গেল যেন।

সরমা বললে,—এত বেলায় কি করে কি হবে! আগে বললে তো হত। তাছাড়া আমাদের ঘরের রান্না।

—তা কেন! বলে শশিনাথ,—একটা উনুন ধরিয়ে আলাদা করে রান্না কর। গোবিন্দের ভোগ হবে, সেই প্রসাদ পাবেন।

—কি বুদ্ধি! গোবিন্দের ভোগ কি একটু পায়েস ছাড়া হয়। দুধ কই অত, মিষ্টি কই। কি যে ঝামেলা কর।

রূপমঞ্জরী ঘরে আসে ততক্ষণে,—তা হোক না বৌদি। দাদার যখন ইচ্ছে, তখন গোবিন্দের ভোগ হোক। ঠাকুরঘরে আলগা উনুনে আমিই রাঁধব।

শশিনাথ যেন বাঁচে।

তা মন্দ নয়। মঞ্জরী বরং রাঁধুক।

মঞ্জরী বলে তুমি বরং আধসের নোতুন গুড় এনে দাও। সুজি তো ঘরে আছে। দুধ আমি নিয়ে আসি গোপাল গয়লার বাড়ি থেকে। সুজির পায়েস হবে'খন।

—তাই ভালো হবে,—শশিনাথও খুশী।

সরমা বলে,—ভাই-বোনে মিলে যা হোক কর, আমি এই দুপুরে আর খাটতে পারব না।

সরমা আবার সন্তানসম্ভবা। পারবেই বা কি করে। শশিনাথ বোঝে। চুপ করে থাকে।

মঞ্জরী হাসে,—বাব্বা! কি রাগ গো! তুমি খোকনকে খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়াও গে যাও। এদিককার সব আমি করব।

শশিনাথ দোকানে যায়। মঞ্জরী একটি ঘটি নিয়ে যায় গয়লা বাড়ি, দুধ আনে। গুড় আসে। ঠাকুরঘরে আলগা উনুনে রান্না চাপানো হয়।

মঞ্জরীর একাগ্র আগ্রহে রান্না শেষ হতে বেশী সময় লাগে না।

কোমরে আঁচলখানা জড়িয়ে নেয় মঞ্জরী। সব রান্না বাটিতে, থালাতে ঢেলে সাজিয়ে দেয়, গোবিন্দের সামনে।

শিলামূর্তি গোবিন্দের ভোগ আজ, শুধু শিলা আজ নয়। তিনি রূপ ধরে আসবেন রূপমঞ্জরীর সেবা গ্রহণ করতে।

ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে আগুনের তাপে। টিকালো নাকের ডগায় ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু। ঈষৎ আরক্তিম চোখ দুটায় চাপা আনন্দের চাঞ্চল্য জমাট বেঁধেছে। অসমর্থা রূপমঞ্জরী সমর্থা প্রেমের আস্বাদ পেতে চায়।

এত ভাগ্য ওর কেনই বা হবে না!

কৃষ্ণ-করুণা ভাবঘন হয়ে কেন উঠবে না ওর কাছে!

ও তো জীবনে কিছুই চায় নি। শুধু চুপ করে থেকেছে, তরোরিব সহিষ্ণু না হলেও ওর ধৈর্যের বাঁধ সুতীব্র কামনার বন্যাকে ঠেকিয়ে রেখেছে আজও।

আজও একাঙ্গী প্রেম-কামনায় নগ্ন হয়ে ওঠে নি রূপমঞ্জরী।

ও কি সমর্থা নয়?

না সমর্থা ও নয়।

নীলকেশরের নবনীত রূপ ওর কামনাকে জাগিয়েছে, এমন কথা জোর করে অস্বীকার করবার উপায় নেই। মাত্র একদিনেই—এমন কি করে হয়? কি করে হয় ও জানে না, ও শুধু জানে নীলকেশরকে ভালো লেগেছে, কাছে পেতে ভালো লাগছে, কাছে আসবে শুনলে কেঁপে উঠছে, কথা বলতে গিয়ে অনেক অনেক কথা একবারে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্নের কথা ভাবতে ভালো লাগছে, রোমাঞ্চ হচ্ছে, নীলকেশর এই নামটি শুনলেই ওর বুকটার ভেতর কেমন করে উঠছে।

এই সহজ ভাবগুলো সহজেই আসছে।

চেষ্টা করেও এতদিন আসে নি।

আনন্দলালের কথা মনে হয়।

আনন্দলালের কথা অনেক ভেবেও ও মনে কোন সাড়া পায় নি। আনন্দলালের শুদ্ধ লয় বোধ আর তানের গম্ভীর মূর্ছনা ওর কানে মধু ঢালে নি। কিন্তু আজ ভোরে—অয়ি নন্দতনুজ—নীলকেশরের ভাববিহ্বল

সুর তাকে মধুময় করে তুলেছে। আনন্দলালের গান ভুলনায়ই আসে না।

ইচ্ছে করে কি এমন হয়?

ভাবতে নিজেরই অবাক লাগছে ওর।

ঘামে ভেজা আতপ্ত গালের ওপর হাত রেখে বসে আছে রূপমঞ্জরী।

কস্তুরীমৃগের মতো আপন গন্ধে বিস্ময় জেগেছে ওর মনে।

এ জন্মের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে এতদিনে।

—জয় রাধে! জয় রাধে!

চোখেমুখে হঠাৎ খুশি ঝলমল করে ওঠে।

—জয় রাধে!

শুধু কানে শোনা নয়। প্রাণে শোনা।

মর্মে বিঁধেছে ফুলশর।

বেরোতে গিয়ে বেরোতে পারে না রূপমঞ্জরী।

দাদা বাড়ি নেই, স্নান করতে গেছে।

দাদাকে না পেয়ে ফিরে যায় যদি?

মঞ্জরী উঠতে পারে না।

বিবশা হয়ে ঘামতে থাকে।

এত শীতেও ঘাম!

কেন উঠতে পারছে না মঞ্জরী?

কেন বলতে পারছে না—ভেতরে আসুন। এতসময় আপনারই প্রতীক্ষায় রয়েছি প্রতি মুহূর্তে।

আসুন! আমার সেবা গ্রহণ করুন।

আমাকে পূর্ণ করুন। আমাকে ভরে দিন।

আমি বড় নিঃস্ব! আমার কিছু নেই। আমার কেউ নেই। এ জন্মটা বৃথা কেটে যেত।

রূপমঞ্জরীর চোখ দুটো ভিজে উঠছে কেন?

ছি! ছি! এক ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীকে সে ভাবনায় কলুষিত করছে।

কপালের ওপর থেকে খুচরো চুল সরিয়ে নেয় হাত দিয়ে।

কোমর থেকে আঁচল খুলে মুখটা মোছে।

আজন্ম ব্রহ্মচারী নীলকেশর। নারীসঙ্গ-বিরক্ত সন্ন্যাসী।

রূপমঞ্জরী এত বড় অন্যায় কেন ভাবতে পারছে। ছি, ছি!

ওঠে মঞ্জরী।

ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসে ঠাকুরঘরের বাইরে দাওয়ায়।

তাকায় চারদিকে

কই কাউকে তো দেখতে পাচ্ছে না।

তবে কি চলে গেল। সাড়া না পেয়ে চলে গেল!

আবার ভালো করে তাকায় রূপমঞ্জরী। কেউ নেই। শীত দুপুরে তীব্র রৌদ্রে পুড়ে যাচ্ছে উঠোনের মাটি। সজনে গাছে বসে ডাকছে একটা কাক।

চলেই গেছে।

ঘরে ফিরে আসে।

বাটি-বাটিতে সাজানো রান্না পড়ে রয়েছে। শিলামূর্তি গোবিন্দের সামনে।

তাকায় একবার মঞ্জরী।

রান্নাগুলো সব যেন ছাই হয়ে গেছে।

সব ছাই!

বড় ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। কাত হয়ে শুয়ে পড়ে একপাশে মাথায় একটা হাত রেখে।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। শশিনাথের ডাকে উঠে বসতে হয়। শশিনাথ ফিরে এসেছে স্নান সেরে।

—কইরে তোদের সব তৈরী হল? আসুন, ভেতরে আসুন।

মঞ্জরী উঠে দাঁড়ায়।

শশিনাথ ঘরে ঢোকে।

পেছনে গেরুয়াপরা সৌম্য সাধু নীলকেশর।

—উনি ডাকছিলেন, তোরা সাড়া দিসনি? সাধুভাই চলে যাচ্ছিল।

ভাগ্যিস পথে দেখা। ধরে নিয়ে এলুম। যাবেন কোথায়? গোবিন্দ আপনাকে টানছে এখানে।

রূপমঞ্জরী মুখটা নীচু করে থাকে।

নীলকেশর একটু হাসে শুধু।

আর কোন কথা নয়। গোবিন্দের প্রসাদ সেবা করতেই হয় নীলকেশরকে। রূপমঞ্জরী নীরবে থালা-বাটি সাজিয়ে দেয় পর পর। একটার পর একটা।

অতি সামান্য খায় নীলকেশর।

শশিনাথ বসে ছিল :লে,—এ কি, কিছুই তো খেলেন না!

নীলকেশর তেমনি হাসে মাত্র।

রূপমঞ্জরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—খুব ভালো লাগল।—এতক্ষণে কথা বলে নীলকেশর—রান্নাটি বড় ভালো হয়েছে! এত ভালো রান্না তো আমাদের জোটে না। তাই বেশী খেতে নেই।—বলে হাসতে থাকে নীলকেশর।

আবার ঘামতে থাকে রূপমঞ্জরী।

ভালো রান্না না ছাই। নিজে রেঁধে খেয়ে অভ্যেস। তাই খারাপ রান্না হয়তো বা ভালো লাগছে!

ভালো রান্না বলবার কি দরকার ছিল!

মঞ্জরীর বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। তার এত ভাগ্যি কিছুতেই হতে পারে না।

নিশ্চয়ই বানানো কথা।

—সুজির পায়েস আর একটু — বলে শশিনাথ।

—পায়েসটি এত ভালো লাগল। একটু বেশীই খেয়েছি।

আবার! আবার ওই সব কথা!

এত কথা কি না বললেই নয়।

ভালোই যদি লেগেছে তবে সবটুকু খেয়ে নিলেই তো হত।

—মঞ্জরীই সব রেঁধেছে—বলে শশিনাথ।

নীলকেশর তাকায়।

মঞ্জরী মুখটা ঘুরিয়ে নেয় শিলামূর্তি গোবিন্দের দিকে।

দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচত ও।

নীলকেশর উঠে বাইরে আসে।

—আমার ঘরে একটু বিশ্রাম করুন।

বলতে বলতে হাতে জল দেয় শশিনাথ বাইরে এসে।

নীলকেশর বলে—না, বাইরেই থাকব।

হাতমুখ ধুয়ে শশিনাথের সঙ্গে কথা বলে ভেতরে আসে গোবিন্দ-শিলাকে প্রণাম করতে। ভেতরে ঢুকে অবাক।

এর ভেতর এঁটো বাসন এক কোণে রেখে ঘর পরিষ্কার করে একটা চাটাইয়ের ওপর মোটা চাদর পেতে একটি বালিস আর সেই মোটা চাদরখানা শিয়রের কাছে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

—বাইরে যাওয়া হবে না।—কথাটার ভেতর একটু অধিকারের প্রশ্রয় আছে।

নীলকেশর অবাক হয়ে তাকায় রূপমঞ্জরীর দিকে।

শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে রূপমঞ্জরী।

—এই বিছানায় বিশ্রাম করুন।

নীলকেশর একটু অবাক হয়েছে বইকি!

—ভয় নেই। এটা আমাদের কারো ঘর নয়। ঠাকুরের ঘর। বসুন, আমি আসছি একটু হরতকি নিয়ে।

এঁটো বাসনগুলো হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় রূপমঞ্জরী নীলকেশরকে অবাক করে দিয়ে।

বসতে হয় নীলকেশরকে।

ভেবে বিস্ময় লাগে ওর। বৈষ্ণবীর বিনয় নীলকেশর জানে। অতিথি সেবা ও দেখেছে, কিন্তু এ যেন শুধু তাই নয়। আরও কিছু।

রূপমঞ্জরীর প্রতিটি কথায়, কাজে যেন নীলকেশর এক অভিনব অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করে।

নীলকেশর বুদ্ধিমান।

সময়ে সময়ে বোকা হওয়াটাই বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

নিতান্তই বোকা হয়ে বসে থাকে নীলকেশর।

হরতকির কয়েকটা টুকরো নিয়ে ঘরে ঢোকে মঞ্জরী।

চোখে মুখে জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে ও। গালের ওপর কয়েকটি জলের ফোঁটা।

দু'হাতে খুলে-যাওয়া খোঁপ জড়িয়ে নেয়। হাতের পাতা বোলায় সামনের চুলের ওপর ক্ষণে দুখানা বাতাসা আর এক গেলাস জল খেয়ে ঘরে আসে।

—নিন ধরুন।—হরিতকির টুকরোটি নীলকেশরের হাতে দেয়।

একটু হেসে হঠাৎ বলে মঞ্জরী,—আপনি বড় কৃপণ।

নীলকেশর বোকার মতো তাকায়।

—পা দুটো গুটিয়ে বসে আছেন। বাড়িয়ে দিন—

নীলকেশর নীরবে পা দুটি বাড়িয়ে দেয়।

গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে মঞ্জরী পায়ের ওপর ওর মসৃণ ঠাণ্ডা কপাল ঠেকিয়ে।

নীলকেশর হাত জোড় করে প্রতি-প্রণাম করে মনে মনে।

একটু বেশী সময় পাদস্পর্শ করতে চায় রূপমঞ্জরী।

হাত দুটো কাঁপে ওর। দেহটিও।

ওঠে মঞ্জরী। চোখের ভ্রমরকালো পল্লবদুটি ওঠে না ওর।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

৬

আনন্দলাল টাকা নিয়ে চলে এল সেদিন। উমা মল্লিক দোরের কাছে এল আবার। দেখল আনন্দলালকে যতক্ষণ দেখা যায়। ঘৃণার বিষে চোখ দুটো জ্বলছিল ওর। ক্রমে আনন্দলাল ভিড়ে মিশে গেল। উমার চোখ স্তিমিত হয়ে এল ক্রমশ। নিদারুণ উত্তেজনার পর স্থির হতে চাইল উমা মল্লিক।

স্থির হতে পারা যায় না। ওকে যতখানি ঘৃণা করেছে, ততখানি বেদনা পেয়েছে নিজে। এক অদ্ভুত পুরুষ আনন্দলাল।

ওকে ভালোবেসে ভুল করেছিল উমা?

মোটেই নয়।

নীল বিষের বেদনায় এক গোপন আনন্দ আছে। আনন্দলালের ভালোবাসা আকণ্ঠ পান করে কণ্ঠ নীল হয়েছে উমা মল্লিকের।

কি ভীষণ পুরুষ। হেসে বলেছিল, আরও অনেক ছিল তোমার মতো।

উমা মল্লিক হয়তো বা ওর শেষ শিকার।

শিকার কথাটায় কৌতুক নেই। কথাটি নিষ্ঠুর সত্য।

জালে বাঁধা জানোয়ারকে মৃত্যুর দুয়ারে রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখার আনন্দ।

আনন্দলালের জালে যে পড়ে সেই জানে।

উমা মল্লিকের মুখখানায় নীল ছড়িয়ে দিয়েছে যেন কে।

ও ধীরে ধীরে দোরটা বন্ধ করে ঘরে আসে।

ঘরে বসেছিল দুটি ছাত্রী। আর একটি বান্ধবী অধ্যাপিকা।

ও ঘরে ঢুকে যেন অনেক ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।

একটি ছাত্রী শুধোয়---কে এসেছিল উমাদি?

ম্লান হাসে উমা—একটা ভিখারী।

ছাত্রীটি বলে,—শরৎবাবুর লেখার ওপর একটা প্রশ্ন আসবেই উমাদি। 'গৃহদাহ' সবচেয়ে ভালো লেখা?

—নিশ্চয়ই,—ক্লান্ত স্বরে বলে অধ্যাপিকা উমা।

—অন্য অধ্যাপিকাটি বললে, ঠিক বুঝিনে ভাই। অচলার টানা-পোড়েনটা কেমন যেন—

—বোঝবার কথাও তোমার নয়! তুমি বায়োলজি পড়াচ্ছ তাই পড়াও! আজ মাথাটা বড় ধরেছে ভাই

ছাত্রী দুজনই বলে,—তবে আজ থাক! চলি উমাদি!

—আচ্ছা এসো। রোববারে এসো আবার দুপুরে।

বান্ধবীও চলে যায়।

একা একা বসে থাকে উমা। মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে টেবিলের ওপর মাথাটা নুইয়ে দেয়

একটু পরেই আসবে সুশান্ত।

ভাবী ডক্টর সুশান্ত হালদার। ডক্টরেটের জন্যে এক বিরাট থিসিস্ লিখেছে একবছর।

অধ্যাপনা করে। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার পথ খুলে যাবে। ভালো লাগে না সুশান্তর কথাগুলো।

কেমন যেন বড্ড ভালোমানুষ। মেয়েলী কণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে গলে পড়ে যেন।

পুরুষ মানুষের সরু গলা বড়ই বিশ্রী লাগে উমার।

নরম নরম খাটো ভালো মানুষ সুশান্ত।

আজ এলে বিদেয় করে দোব দু-চার কথা বলে।

বিদায় করতেও কেমন মনটা খারাপ লাগে।

সুশান্তর চোখ দুটো কেমন নেভা-নেভা জোলো হয়ে উঠবে। ঠোঁটটা শুকিয়ে উঠবে। দুবার ভিজিয়ে নেবে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট।

—আচ্ছা চলি তবে।—বলেও দাঁড়িয়ে থাকবে একটু সময়।

হাসি পায় ভাবতে উমার।

আনন্দলাল থাকলে দুটো ঝাঁকানি দিত বোধ হয় সুশান্তকে।

নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর আনন্দলাল যে সুশান্তর চেয়ে কত ওপরে ভেবে বিস্মিত হয় উমা। আনন্দলাল ভালো নয়। আনন্দলাল জুয়াড়ী। রূপসী বিমোহনে সিদ্ধ পুরুষ। মাথায় কালো সিল্কের রুমালটি বেঁধে নিয়ে মিঠে পান চিবোতে চিবোতে যখন ঠুংরীর মিঠে গান ধরে—উমার মতো অনেক রূপসীর বুকের ওঠানামা গোনা যায়।

অপরূপ আনন্দলাল।

আনন্দলাল আগুনের মতো অপরূপ।

নিজে জ্বলে, পরকে জ্বালায়। এ ওর ভালো লাগে।

উমা বলেছিল একদিন,—এমনিতেই তো বুক জ্বলছে। মদ খেয়ে বুক আরও জ্বালাও কেন?

—তিলে তিলে পুড়ে যেতে বড় ভালো লাগে। কামনাগুলো সব ছাই হয়ে যাবে একদিন। দেখো।

—নিজে পোড়ো ক্ষতি নেই। অন্যকে পুড়িয়ে লোকসানের বোঝা বাড়াও কেন?

আনন্দলাল হেসেছিল,—আমি তো পোড়াই না। তারা পুড়তে আসে।

কথাটা নিদারুণ হলেও সত্য।

উমা মল্লিক একথা মর্মে মর্মে জানে।

আজও যতখানি ঘৃণা করেছে ও আনন্দলালকে, সেটা ভালোবাসারই উলটো পিঠ মাত্র। এটা আবিষ্কার করতে পারলে ও নিজের ওপর ঘৃণায় লজ্জায় আজ মিশে যেত।

মনের এ গোপন খবরটা ধরা পড়ে না ওর কাছে।

ও শুধু বুঝতে পারে এক গভীর বেদনার ক্লান্তি। হয়তো বা আনন্দলালের ওপর রাগ করবার পর অবসাদ। সত্যি কি তাই?

উমা মল্লিক একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ে

এক অক্ষরও পড়তে পারে না।

ওর শুধু মনে হয় বারে বারে সেদিনের কথা। যেদিন আনন্দলাল মাতাল হয়ে ওর গায়ে হাত দিয়েছিল। ওকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল টেবিলের পাশে। ওই টেবিলটারই পাশে। মাতাল বলে ক্ষমা করতে পারল না উমা।

ওকে ধরে টানতে টানতে বাইরে বার করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে দরজা আজও খোলে নি।

বলেছিল উমা,—মদ যদি কখনও ছাড়তে পারো, সেদিন আমার কাছে এসো। তার আগে নয়। আনন্দলাল নির্বিকার চিত্তে চটিটা পরে চলে গিয়েছিল।

বহুদিন আসে নি আর।

এত অত্যাচার সয়ে ওকে তাড়িয়েছিল উমা। এত অপমান!

তবু তার জন্যেই আবার কেঁদেছে। অনেক অনেক বিনিদ্র রাত কেটে গেছে ওর কথা ভেবে ভেবে। কে জানে কোথায় গেল? হয়তো বা খেতেই পায় নি। রাস্তায় মদ খেয়ে পড়ে আছে। বিশদিন না খেলেও মুখের হাসি ওর যাবে না। এমন অদ্ভুত মানুষ!

উমা বিখ্যাত ধনী বংশের মেয়ে। আনন্দলালকে ভালোবেসে সব ত্যাগ করেছিল। বাবা মা, ভাই বোন। সব।

নিজে অধ্যাপনা করত। আনন্দলাল গান শেখাত।

দিনগুলো কেটে যেত নিরুদ্বিগ্ন বাতাসে হালকা পালকের মতো।

আনন্দলাল মদ খেত।

প্রথম প্রথম কিছু বলত না উমা।

আনন্দলাল জুয়া খেলত।

তাও কিছু বলত না।

সময়ে অসময়ে মদের টাকা চাইত।

নীরবে দিত উমা।

এতোতেও হল না। শেষ পর্যন্ত উমার ওপর অত্যাচার শুরু

করল ও। দিন দিন সে অত্যাচার বেড়েই চলল। তাও কিছু বলে নি উমা।

তারপর শেষদিন এল।

মার খেয়ে আর সইতে পারে নি উমা।

উমার কি দোষ?

আনন্দলালেরই বা কি দোষ?

চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবে উমা।

তারপর সুদীর্ঘ সাড়ে ছ বছর কেটে গেছে। আরও কতকাল কেটে যাবে কে জানে?

বুকের ভেতরটা কিছু নেই মনে হয় এক-এক সময়। দম নিতে কষ্ট হয়। তবু স্থির হবার চেষ্টা করে উমা মল্লিক।

যদি কখনও আনন্দলাল মদ খাওয়া ছাড়ে, আবার তাকে ডেকে নেবে। ডেকে নিতে কি পারবে? অত সহজে এখন গ্রহণ করা?

কী ভাববে সবাই?

সুশান্ত কী ভাববে?

কী ভাববে মিস্ মজুমদার—ওর বান্ধবী?

তখন কেমন লাগবে?

ভাবতে পারে না উমা। বইটা বুকের ওপর রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন মেসে বসে ছাত্রদের গান শেখাচ্ছে আনন্দলাল। রাগ সোহিনী। গভীর রাত্রির জোলো বাতাসের মতো গভীর বেদনাভরা সুরে।

তানপুরায় টঙ্কার দেয় খুব আলতো করে। শব্দতরঙ্গ সুরে মিলে সমস্ত ঘরের বাতাস গম্ভীর হয়ে ওঠে।

শশিনাথও এসেছে আজ

আনন্দলাল চোখ বুজে ধরেছে গান।

অনেকটা মদ খেয়ে এসেছে। একাগ্র আরামে মন ভরে আছে।

আনন্দলাল গেয়ে চলেছে। বেদনার গাঢ় রসে ডুবে যেতে হয়।

ঋষভের কোমল মোচড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় ছাত্ররা।

অনেক অনেক আগের কত ব্যথার দিন! মোচড়ে মোচড়ে তরঙ্গায়িত হয় মনে।

রাগ সোহিনী!

আনন্দলালের গালের ওপর কখন যে জল গড়িয়ে পড়ে কেউ টের পায় না। আনন্দলালও নয়। এ সুরের ব্যাপ্তিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে সব ছাত্রই।

গান থামবার পর কিছু কিছু স্বরগ্রাম লিখে নিয়ে একে একে ছাত্ররা বিদায় হয়।

আনন্দলাল আজ মৌন গম্ভীর হয়ে বসে থাকে।

শশিনাথকে বসতে বলে শুধু।

শশিনাথের সঙ্গে গ্রামে যাবার পর থেকে ওর ভেতর ভেতর এক ওলটপালট হতে চলেছে। পুরোনো সব কাঠিন্য ঝরে পড়ছে যেন। মুছে যাচ্ছে কোন এক শীতল নির্ঝরিণীর স্পর্শে। আনন্দলাল বেশী হাসতেও পারে না আর।

কথা বলতে মাঝে মাঝে একেবারে ভালো লাগে না।

তোমাদের গাঁয়ে আর-একবার যাবো শশিনাথ।

শশিনাথ বলে,—বেশ তো, আসবেন। যেদিন আমায় বলবেন সেদিনই নিয়ে যাবো। নয়তো নিজের যেদিন ইচ্ছে হবে চলে আসবেন। আমাকে দোকানেই পাবেন। স্টেশনের কাছেই তো দোকান!

চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে আনন্দলালের। বলে,—দেখি কবে যাই।—বলে একটু থামে। কবে আসছ আবার?—আবার কথা বলে আনন্দলাল।

—পনেরো দিন পরে। বলেন তো সামনের সপ্তাহে,—বলে শশিনাথ।

গলার স্বরটা একটু জড়িয়ে আসে আনন্দলালের,—বোধ হয় নেশায়।

বলে,—এসো আবার। আমি যাবো। তোমাদের গাঁয়ে যাবো। আমি বাঁচবো। বাঁচবো আমি।—

বলতে বলতে কথাগুলো আরও জড়িয়ে যায়।

শশিনাথ ভালো বুঝতে পারে না।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

৭

মাঘীপূর্ণিমা পড়ল এবার ফাল্গুনে। বসন্ত তখনও ফুলসম্ভারে নুয়ে পড়ে নি। কচি কিশলয় দেখা দিয়েছে বিশাল পলাশ গাছে। এক-এক ঝলক বাতাসে মনটা উড়তে চায়। হঠাৎ কান পেতে থাকতে হয় থমকে আমবাগানের ভেতর থেকে ভেসে আসা বুনো পাখির ডাকে। কি পাখি? নাম কি? কে জানে। অত খবর করবার ধৈর্য নেই। তার আগেই মন উধাও।

উধাও মনকে গুটিয়ে আনতে আনতে যেটুকু আস্বাদ পাওয়া যায় তাতেই মন ভোর। অকারণেই এক-এক বার কলাবাগানের ছায়ায় দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়। দক্ষিণ-উত্তরের বাতাসটা গায়ে লাগলেই মুখখানি উঁচু করে তাকাতে হয় আকাশের দিকে। নির্মেঘ আকাশ। সুনীল।

ভোরে আর কুয়াশা নেই। ঘাটের পথে যেতে নানা পাখির কিচকিচ শব্দ। কি যে ছাই বলে ওরা? মনে মনে হাসে রূপমঞ্জরী।

প্রতিদিন ভোরে কানে আসে এখনও মধুগম্ভীর স্বর গোঁসাইয়ের ভিটে থেকে—নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিত বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

অথবা কোনদিন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

সন্ধ্যায় সেদিন শুধিয়েছিল মঞ্জরী এ শ্লোকের কী মানে। কিছুই বোঝে নি ও।

নীলকেশর হেসে বলেছিল—এর মানে নেই। অনুভব আছে। প্রার্থনার অনুভূতি। তবু শোনো। শোনবার মতো মন আছে তোমার।

গম্ভীর হয়ে উঠল নীলকেশর।

—মানে? মানে কী বলব? এ তো গোপীভাবের বড় উঁচু কথা।

রূপমঞ্জরী স্তব্ধ হল ওর সুগম্ভীর স্বরে।

বলছে নীলকেশর—আমি কৃষ্ণপাদসেবা করেই চলেছি। আমি তার সেবাদাসী। যদি ইচ্ছে হয় সে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করুক। আমাকে দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুক। লম্পট। কামুক সে। যেমন খুশি বিহার করুক। তবু—তবু সেই আমার প্রাণনাথ। আর কেউ নয়। কিছুতেই নয়।

নীলকেশর বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে যায়।

রূপমঞ্জরী ওর ভাবসাবল্যে কথা বলতে সাহস পায় না।

সব কেমন নিথর হয়ে যায়। সমস্ত ঘরখানা।

কিশোরী বিমোহনে নিদারুণ লম্পট! কামকৃষ্ণ! কামরাধা! অনঙ্গ-পুষ্পবাণে বিমোহিতা নন্দিনী! এ ভাব গ্রহণ করতেও যে বুকের ভেতর কেমন করে।

গোপীভাবের এত উঁচুভাব ধারণ করতেও ভয় হয়। নিষ্কাম না হলে কৃষ্ণদাস হবে কেমন করে?

রূপমঞ্জরী ভয়ে ভয়ে তাকায়।

নীলকেশর চুপ করে বসে আছে। এর পর আর কথা নেই।

একথা যে সবার শেষ কথা।

রূপমঞ্জরী ধীরে ধীরে উঠতে চায়।

উঠতে পারে না। আর একটু হালকা কথা না হলে ওঠা যায় না।

পুরো নিষ্কাম মন নীলকেশরের। আজন্ম ব্রহ্মচারী নীলকেশর।

সহজেই রসসঞ্চার হতে পারে ওর মনে।

বিন্দুমাত্র কামগন্ধ থাকলে কাম রাধার লীলা বোঝবার উপায় নেই কি করে বুঝবে রূপমঞ্জরী। ও বোধ হয় ভয় পেয়েছে।

ভাবসাবল্য সংবরণ করতে হয় নীলকেশরের।

আজকাল প্রায় রোজই বিকেলে আসে ওর ঘরে মঞ্জরী। আর মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরে শশিনাথ। সন্ধ্যায় ভজন শেষ হবার পর নীলকেশর মাঝে মাঝে পদাবলী কীর্তন করে।

রূপমঞ্জরী ঠাকুরঘরে নাম সেরে কলাবাগানের কাছাকাছি এসে কান পেতে শোনে। শশিনাথও শুনতে যায় মাঝে মাঝে।

বিকেলে গা ধুতে যাবার আগে মঞ্জরী একবার নীলকেশরের ঘরে আসে।

ঘরটা মুছে দিয়ে যায়। প্রদীপের সলতে তেল ঠিক করে রাখে। মাঝে মাঝে জোর করে ময়লা গেরুয়া কাপড় নিতে হয় সাবান দিতে।

কিছুতেই দেবে না নীলকেশর,—না, কাপড় থাক।

মঞ্জরীও ছাড়বে না,—এতো ময়লা পরতে আছে বুঝি?

—থাক আমি কেচে নেব।

—কেন, আমি কি এতই ছোট! কাপড়খানা কাচতেও দেবেন না?

রূপমঞ্জরী রাগে রাঙা হয়ে ওঠে।

নীলকেশর একটু নরম হয়,—না, ঠিক তা নয়।

—আমার ছায়া দেখলে আপনার ঘেন্না হয়, এই তো!—রূপমঞ্জরীর গলাটা কাঁপছে।

একে নিয়ে আর পারা যাবে না!

নীলকেশর হাতজোড় করে,—ছি! ছি! একি কথা! তুমি ভক্তের মেয়ে। কৃষ্ণদাসী তুমি। তুমি তো আমার চেয়েও কত বড়!

—থাক! অনেক হয়েছে।

—সত্যি! তোমাকে রাধা বলেই ভাবি। তুমি কি কম?

নীলকেশর ব্যস্ত হয় ওকে তুষ্ট করতে।

—আর শুনতে চাই না।—বলে কাপড়খানা নিয়ে ঘাটের দিকে চলে

যায় রূপমঞ্জরী। ফেরবার সময় ঠিক ওই দেয়ালের পাশে মেলে দিয়ে যাবে শুকোতে।

বেশ সহজ হয়ে উঠেছে ওরা সবাই। নীলকেশবের সামনে সংকোচ একটুও হয় না আর। যেন হতে নেই। সরমাও কথা বলে। আসে মাঝে মাঝে। শশিনাথও।

মাঘীপূর্ণিমা এসে গেছে প্রায়। সেদিন রূপমঞ্জরী সন্ধ্যার একটু আগে এসেছে। ঘাট থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। উত্তর-দক্ষিণ কোণ থেকে হাওয়া দিচ্ছে আজ। মাঝে মাঝে এক-এক ঝলক বাতাস। জামগাছের পলকা ডালগুলো হুয়ে পড়ছে বাতাসে। আমের বোল ঝরে পড়ছে দু-চারটে। ঝড় উঠবে নাকি ?

মঞ্জরীর মন নেই। কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে সব। উধাও হয়েছে অনেক দূরে। নাগাল পাচ্ছে না নিজের মনের।

হঠাৎ মাটিতে ফিরে এল মন। দাঁড়িয়েছে এসে কলাবাগানের পাশে। কি জানি কেন ঢুকে পড়ল আবার নীলকেশরের ঘরটিতে।

কারণ নেই। নাই বা থাকল। নীলকেশর জিজ্ঞেস করলে কি বলবে ? কিছুই বলবে না। ভারী বয়ে গেল বলতে ! ওর কাছে আবার লজ্জা !

নীলকেশর ওর ছোট আসনখানির ওপর বসে ছিল। তন্ময় কী এক চিন্তায়। থলে থেকে বার করে আসনে রেখেছে এক তাম্রপটে আঁকা কৃষ্ণ-মূর্তি। হাত দুটি বুকের ওপর। একটি হাতের ওপর আর-একটি হাত। একখণ্ড কাঠের আসনের ওপর শ্রীভাগবত। তার ওপর দুটি তুলসী, কয়েকটি সাদা বেলফুল। সদ্য চয়ন করে এনেছে।

মঞ্জরীর ঠাকুরঘরের কথা মনেই পড়ে না। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মঞ্জরী। ওর ঠাকুর বুঝি এখানেই বাস করছে। ঠাকুরঘরে নাম করতে করতে এখানে চলে আসে ওর মন। মনে হয় গোবিন্দ এসেছে এখানে। চোখ বুজে এখানেই মনকে স্থির করে রাখে মঞ্জরী নিজের ঠাকুর-ঘরে বসে। অনেকক্ষণ কেটে যায়। সরমার ডাকে চমকে ওঠে এক সময়।

আজও মনে হল না ওর ঠাকুরঘরের কথা।

এখানেই যেন সব।

ওখানে বসেও তো এখানেই আসতে হবে!

নীলকেশর জপে বসেছে।

মঞ্জরী নীরবে বসে থাকে।

খোলা দোর দিয়ে দমকা বাতাস এসে কাঁপায় ওকে।

কাঁপায় নীলকেশরের বড় বড় চুলের গুচ্ছ।

কাঁপায় ভাগবতের ওপরের পাতাটি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে ক্রমে।

ঘরটা বেশ অন্ধকার হয়ে আসে।

মঞ্জরী অন্ধকারে বসে বসে বাতাসে কাঁপে। বারে বারে রোমাঞ্চ হয় অকারণে।

নীলকেশর নীরব। নিথরও।

সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলল না।

কে বললে?

প্রদীপ জ্বলছে। স্থির প্রদীপশিখা নীলকেশরের নাসাগ্রে।

মঞ্জরীর মনে কত আলো।

অনেক প্রদীপের আলো।

ওরা কেন প্রদীপ জ্বালাবে?

আরও সরে আসে মঞ্জরী।

নীলকেশরের কাছাকাছি।

একটু ভয় নেই? লজ্জা নেই একটু?

ওকে আবার লজ্জা! ভয়!

ভেতরে যেন হাসি পায় রূপমঞ্জরীর।

আরও কাছে। নীলকেশরের গায়ের বাতাস ওর গায়ে লাগে।

সমস্ত-পালক-ফুলে-ওঠা রোমাঞ্চিত পাখির মত বসে আছে মঞ্জরী।

ও কী চায়? ও কেন এত কাছে এসেছে?

কিছু জানে না মঞ্জরী। জানবার উপায় নেই। যে মন দিয়ে জানবে সে মন ওর নেই।

ওর মন হারিয়ে গেছে।

বাইরে শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শোনা যায়।

কে এল ?

বোধ হয় শশিনাথ।

এই সময়টায় শশিনাথ আসে।

মঞ্জরীর কানে যায় না কিছু।

কেউ আসে না।

বোধ হয় একটা বাছুর হেঁটে গেল।

কখন যে ওর গাল দুটো বেয়ে চোখের জল নেমে পড়েছে, টের পায় নি মঞ্জরী।

নীলকেশরের পিঠের ওপর তপ্ত চোখের জল পড়ে।

একটু নড়ে ওঠে নীলকেশর।

আবার স্থির।

মঞ্জরী ভেঙে পড়েছে। কি বেগে আজ নির্ঝরিণী নেমে এসেছে !

নীলকেশরের সামনে এসে পড়েছে মঞ্জরী।

আর একটু ব্যবধানও বুঝি থাকল না।

নীলকেশর নড়ে ওঠে।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে।

এতক্ষণ বুঝি নিশ্বাস পড়ছিল না ওর !

মঞ্জরী ভেঙে পড়ছে।

একটু শব্দে নীলকেশর চোখ তাকায় এবার।

—কে ?

অন্ধকারে একটা কিছু সামনে দেখেও নীলকেশর ভয় পায় না।

খুব আস্তেই বলে ওঠে,—কে ?

উত্তর দেবার মানুষ নেই।

মঞ্জরী উপুড় হয়ে পড়েছে সেখানেই।

নীলকেশর ওঠে। প্রদীপটি জ্বালে।

তাকায় খুব ধীর ভাবে। টানা টানা চোখ দুটোয় ওর আতঙ্ক নেই, চাঞ্চল্য নেই। একটা নিশ্বাস ফেলে আবার—রাধে! রাধে!

এগিয়ে আসে।

—কে? রূপমঞ্জরী।

কথা কে বলবে। অব্যক্ত বেদনাভারে বিহ্বলা রূপমঞ্জরী।

নীলকেশর কাছে আসে।

—ওঠ।

ছোঁয় না নীলকেশর। নারী স্পর্শ করবে না।

মঞ্জরী ওঠে না।

নীলকেশর একটু দূরে বসে ওর কম্বলের ওপর।

মৃদু হেসে করতালি দুটো হাতের আঙুলে বেঁধে নেয়।

খুব আস্তে আস্তে সুর তোলে—

হা হা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।

কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জারে॥

রাতি দিন পড়ে মনে সোয়াথ না পাঙ।

যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাঙ॥

থর থর করে কাঁপে মঞ্জরী। চোখের জলে মাটি ভিজে যায়। সব বলা হল! সব জানে! ও সবই জানে।

গান ধরেছে নীলকেশর।

এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ বিবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥

বুকের ভেতর সব নিঙড়ে নিচ্ছে যেন। বিন্দুবিন্দু রসপানমত্ত রসিয়া ওকে নিঙড়ে নিচ্ছে। বুক ভেঙে যায়! চোখের জলে ভাবরসবিন্দু গলে পড়ে বুঝি।

ধীরে ধীরে প্রগাঢ় শান্তি ফিরে আসে। এমন নির্বেগ প্রশান্তি যে আছে কে জানত।

টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে এক-একটি মুহূর্ত।

অনেক সময় কাটে।

মঞ্জরী উঠে বসেছে। স্থির হয়েছে।

উঠে দাঁড়ায়। নীলকেশরের কাছে আসে।

মাথাটা নীচু করে দাঁড়ায়।

নীলকেশর হাসে এখনও,—বলেছিলাম, তুমি যে কৃষ্ণদাসী। তুমি কি কম!

রূপমঞ্জরী চোখের ভিজে ঘনপক্ষ্ম তোলে। তাকায়।

একটু সরে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

প্রতি-প্রণাম করে নীলকেশর। মনে মনে।

বেরিয়ে যায় মঞ্জরী।

বাড়িতে এসে কাজ সেরে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে ও।

শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে।

গা এলিয়ে দেয়। চোখ বুজে আসে, তবু ঘুম আসে না।

আবার সেই স্বপ্ন। প্রায় রোজই এ স্বপ্ন দেখতে পায় ও। যমুনা-কিনারে তমাল তরুর সারি। কদম ফুলে ভরা গাছটি। আজও সে বসে আছে। কৃষ্ণামৃতপ্রবাহিনী যমুনা-তীরে। ঘাস ফুলের মতো গায়ের রঙ। ঈষদারক্ত পদ্মকর্ণিকার মত বড় বড় দুটি চোখ। ছোট ছোট দুটি পা। পা দুখানি আজ বুকে জড়িয়ে ধরেছে মঞ্জরী।

অঝোরে কাঁদছে যেমন কেঁদেছিল নীলকেশরের কুটিরে।

ফুলে ফুলে ওঠে সর্বাঙ্গ।

ঘুম ভেঙে যায়।

ঘেমে উঠেছে রূপমঞ্জরী।

কপালের ঘাম মোছে। হাতপাগুলো এখনও অবশ লাগছে।

উঠে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

পরদিন বিকেলে আবার এসেছে মঞ্জরী। গভীর ভাব আজ সম্পূর্ণ গোপন করে ফেলেছে। বাইরে বোঝবার জো নেই। কাল এই ঘরের সন্ধ্যার ঘটনাটি যেন এক সুস্বপ্ন। মন থেকে মোছবার চেষ্টা করা নয়, মনের তলায় লুকিয়ে ফেলা।

—কি গো সাধু মহারাজ। শ্রীভাগবত রেখে উঠুন। ঘরটি ঝাঁট দিয়ে দিই।

নীলকেশর বসে বসে ভাগবত পড়ছিল।

তাকায় মঞ্জরীর দিকে। মঞ্জরী হাসছে। যেন কিছুই হয় নি। এই সবে দেখা। কাল দেখাই হয় নি। নীলকেশর একটু অবাক হয়।

মঞ্জরীর এই মুচকি হাসিটি বড় অপরূপ। টিকালো নাকের পাতলা পাতা দুটি ফুলে ফুলে ওঠে। সরু চিবুকের ওপর একটি ছোট ঘূর্ণির মতো টোল।

নীলকেশর তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

মঞ্জরী তেমনি হাসে ঘাড়টি একটু বেঁকিয়ে। বলে—চোখের পলক পড়ছে না যে! কি দেখছ, ঘেন্না করতে পারা যাবে কিনা!

মঞ্জরীর মুখে তুমি সম্বোধন আর এমন সত্যি ঠাট্টায় নীলকেশর হকচকিয়ে যায়।

মঞ্জরী যে ইচ্ছে করে তুমি বলেছে তা নয়। মুখে আর আপনি আসছে না। জোর করেও আসছে না।

নীলকেশর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে বলে—সত্যি কথা—দেখছি তোমার হাসি।

খিল খিল করে হাসতে থাকে মঞ্জরী—ব্রজের হাসিতে মন ভরে নি।

—ব্রজে কেউ এমন হাসে না। তোমার হাসিটার মানে কি বলো তো?

—মানে? মানে তোমার কথা ভেবে। বাপমা ছেড়ে, ঘর ছেড়ে বৈরাগী হয়েছ। নিজের কাজ তো নিজে কিছুই করতে পারো না। বৈরাগী হবার কি দরকার ছিল শুনি?

নীলকেশর আজ একটু হালকা হয়েছে,—কেন কে জানে। বড় ভুল

হয়ে গেছে। বৈরাগী হবার আগে তোমায় একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

ফাল্গুনের জোরালো বাতাস ওর গাম্ভীর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। নীলকেশর কখনও তো এমন ভাবে কথা বলেনি মঞ্জরীর সঙ্গে।

মঞ্জরী ঘর পরিষ্কার করে।

কম্বলটা তুলতে তুলতে বলে।—নিশ্চয়ই উচিত ছিল। কম্বলের এক-মণ ধুলো ঝাড়তে হত না তবে।

—তোমায় তো পরিষ্কার করতে কখনও বলি নি?

—বললেই বুঝি করতাম মনে করেছ। বলো নি বলেই এত জ্বালা।

নীলকেশর হাসে।

—কম্বলটা ধুয়ে দোব আজ। কিন্তু শোবে কী পেতে?

—কেন, গায়ের চাদর পেতে।

—এই ঠাণ্ডা মাটিতে চাদর পেতে! এই না হলে সাধু! আমার গরম চাদরটা দিয়ে যাব।

—কি দরকার ছিল?

—ভয় নেই। ওটা ধুয়ে তুলে রেখেছি। আমার ছোঁয়া নয়। ছুঁই-ছুঁই করলে কি আর ভগবান মেলে।

—ঠিকই বলেছ। এটা ছোঁব না ওটা ছোঁব না ভালো নয়।

—নয়ই তো।

মঞ্জরী বসে পড়ে। চোখ দুটো মেলে ধরে নীলকেশরের মুখের ওপর।

ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁগো মহারাজ, তোমার বাপ-মার কথা মনে হয়?

নীলকেশর হেসে ফেলে—হঠাৎ একথা কেন?

—এমনি। বলো না?

—বৈরাগীর ও সব কথা মনে করতে নেই।

—কেন? মহাভারত বুঝি অশুদ্ধ হয়?

—হ্যাঁ! হয়।

—কক্ষনো নয়। বাপমা কত বড় ঠাকুর।

—তবু পূর্বাশ্রমের কথা ভুলে যেতে হয়।

—একদিন মনে করলেই একবারে অসাধু হয়ে যাবে?

—তা নয়! বাপমায়ের কথা মনে যে হয় না এমন নয়।

—মা কেঁদেছিল তোমার গেরুয়া পরা দেখে?—ভিজে গলা মঞ্জরীর।

নীলকেশর হেসে ফেলে আবার।

—প্রথম কয়েকবার কেঁদেছিল।

—তোমরা কি খুব বড়লোক ছিলে?

—ছিলাম। চোদ্দ হাজার টাকা আয় ছিল।

—মার সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নি?

—অনেকদিন। বৃন্দাবনে থাকবার আগে বছর পাঁচেক আগে শেষ দেখা।

—মন কেমন করে না? তুমি কি গো!

নীলকেশর হাসে,—মিছে বলব না, মন কেমন করে এক-আধবার আর-একজনের জন্যে।

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে।

মুখটা মুহূর্তে সাদা হয়ে যায় মঞ্জরীর।

বিসদৃশ ভাবে একটু হাসে, বলে,—আর-একজন কে?

নীলকেশর চুপ করে থাকে।

মঞ্জরীর বুকের ওঠানামা বেড়ে যায়।

—কে সে? বলা যাবে না?

নীলকেশর হাসে তবু,—কেন বলা যাবে না। আমার ছোট ভাইটি। আসবার আগে কিছুতেই ছাড়বে না। বলে, দাদা আমিও যাব।

হাসে নীলকেশর।

মঞ্জরী বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস চেপে যায়,—কতটুকু সে।

—খুব ছোট। এখন বোধহয় তেরো হবে।

মঞ্জরী আবার ছেলেমানুষের মতো বলে,—তুমি কেন সাধু হলে ?

—নইলে তো দেখা হত না।—বলেই চোখটা নামায় নীলকেশর।

আবার বলে,—তোমাদের মতো ভক্তের কৃপা পেতাম না।

একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে নীলকেশর।

মঞ্জরী তবু বলে, তোমার সাধু হওয়া উচিত হয় নি।

—এ সব কথা থাক, বলে নীলকেশর,—অষ্টপ্রহরের কি হবে বলো তো ?

—কি আবার হবে ?

—আর চারদিন পর অধিবাস !

—দাদা সব জোগাড় করে রাখবে। কিছু ভাবতে হবে না।

—কটি দল আছে এখানে ?

—হিসেব হচ্ছিল সেদিন। হরিসভা আছে আশে-পাশের গাঁ মিলিয়ে ছটি। ছদল গাইবে, তার ওপর আরও আসবে দূর থেকে।

—তাদের সব খরচা ? কিছু ভিক্ষে কি মিলল ?

—দাদাকে জিজ্ঞেস করো।

—শশিনাথ তো আসে না কদিন।

—আজ কলকাতা যাবার কথা। কাজ পড়েছে বেশী। হিসেব-পত্তর হচ্ছে, পয়লা বোশেখের সব হিসেব মিটিয়ে রাখতে হবে তো ? আর তো দেড় মাস বাকি।

—তা বটে।

রূপমঞ্জরী ওঠে।

—কম্বলখানা নিয়ে চললুম। চাদর দিয়ে যাব।

—আবার কেন কষ্ট করে আসা।

হাসে মঞ্জরী,—তাই তো, দুকোশ দূর ! তাও যদি বাড়ি থেকে দুপা না হত !

হাসতে হাসতে কম্বল নিয়ে চলে যায় মঞ্জরী ঘাটের দিকে।

নীলকেশর বসে থাকে।

ভাবতে অদ্ভুত লাগে। এ কি কৌতুক নিত্য নূতন! রূপমঞ্জরীর মধুর স্নিগ্ধ রূপ আছে। তার চেয়েও বেশী গভীরতা আছে অন্তরের রূপে।

নীলকেশর জানে স্বরূপ সুন্দরের জন্ম মনে। বাইরে নয়।

অসামান্যা রূপকন্যাকেও মনে ভালো না লাগলে কুশ্রী মনে হয়। নিতান্ত সাধারণ রূপবতীকেও মনে ভালো লাগলে অসামান্যা মনে হয়।

মনের বিচিত্র লীলা। এ যেন কৌতুকময়ীর কৌতুক।

কৃষ্ণময়ীর শ্রীময়ী মায়া রসাস্বাদ।

রূপমঞ্জরী যখন এসে দাঁড়ায় নীলকেশর ভাববিলাস লক্ষ্য করে ওর চোখে মুখে।

প্রতিটি কথায় যেন ওর কোন এক রসাভাস পায়।

গোঁসাইয়ের চরিতামৃত পাঠ মনে পড়ে ওর।

পরিষ্কার কানে বাজে।

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দণ্ডাইয়া।
তিন-অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥
মুখ নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার॥

শুনে তখন মুগ্ধ হত নীলকেশর।

শ্রীরাধার ললিতালঙ্কার—কি অপরূপ এই কান্তা ভাব।

মনে মনে এক সুপবিত্র প্রেম ভঙ্গিমায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

রাধা চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেত।

রূপমঞ্জরীর ভাব যেন ললিতালঙ্কার কান্তাভাব স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ ভাব সশরীরে উপভোগ করবার মতো মন তার তৈরী নয়।

যদি ভাবচ্যুত হয়ে সঙ্গতৃষ্ণা আসে?

যদি ভাবের চেয়ে ভাবীর দিকে চোখ বেশী পড়ে?

এমন তো কোন দুর্বল মুহূর্তে হতেই পারে। রূপমঞ্জরী উত্তীর্ণা সাধিকা নয়। তার জড়রূপ তৃষ্ণা আসতেই পারে।

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয় নীলকেশরের।

শেষে কি সবই বৃথা যাবে। এত কঠিন ভাবসাধনে সব নষ্ট হয়ে যাবে? সব হারাতে হবে?

আজন্ম ব্রহ্মচারী নীলকেশর।

নারীসঙ্গতৃষ্ণার স্থান নেই ওর মনে। অপাপবিদ্ধ শুদ্ধমনকে ও ক্লেদাক্ত করবে কেমন করে?

আজ এও কি এক পরীক্ষা?

পদ্মে অলি বসবে, কিন্তু মধুপান করবে না।

এ যে অসাধ্য সাধন! কথাটা এত সহজ কিন্তু কাজটা সবচেয়ে কঠিন।

নীলকেশর জানে পূর্ণ ভাবশুদ্ধি না হলে এমন কথা বোঝাই যায় না।

তাই তো, এত বাধা এত নিষেধ।

যোষিত-সঙ্গ থেকে এত দূরে থাকবার চেষ্টা।

রূপমঞ্জরীর লীলবিভ্রম তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি, ও জানে। কিন্তু বিভ্রান্ত করবে না এমন কথা হলপ করে বলা যায় না।

নীলকেশর সাবধান।

ব্রহ্মচারী ব্রতী নীলকেশর এত সহজে হারবে না।

যা এল তাকে মেনে নাও। যা আসবেই তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক। তার সামনে অটল প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়াও। তাকে জোর করে বাধা দিতে গেলে ফল উলটো হবে। বাইরে থেকে সে অদৃশ্য হয়ে অন্তরে আড়ালে বসবে, তারপর এক ক্ষীণ মুহূর্তে তার পুষ্ট প্রভাবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। এ তো গোসাইয়ের কথা।

মেনে নাও। মেনে নাও নীলকেশর।

মানতে গেলে যে আতঙ্ক, ভয়।

ভয় পাবে না নীলকেশর। ওকে অগ্রাহ্য করবে। করবেই।

স্থির হয়ে বসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় ও।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলোটি জ্বালিয়ে আসন নিয়ে বসে।

রূপমঞ্জরীকে অগ্রাহ্য করবে ও। ও একটা চিন্তার কথাই নয়। একেবারে ভাববে না।

৮

রাগ মালকোশ। বিশ্ব সংসারটাই যেন মালকোশের মেজাজে টলমল করে কাঁপছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে আনন্দলাল। ছাত্ররা সবাই এসে একে একে ফিরে গেছে। কেউ গাইল না।

কত বললে আনন্দলাল,—মালকোশ গাও।

কেউ গাইল না!

নিদারুণ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে আনন্দলালের। মাথাটায় যেন অনেক পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে মনে হচ্ছে। কে যেন বেঁধে রেখেছে কপালের দুদিক। চোখ দুটো পলাশফুলের মতো রাঙা। শিয়রের কাছে একটা কলাইয়ের গেলাসে পড়ে রয়েছে আধগেলাস জল।

দু দিন ধরে জ্বরে বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে আনন্দলাল।

মেস থেকে একবাটি বালি এনে রেখে যায়। দুদিন খায় নি আনন্দলাল। ফেলে দিয়েছে। খেয়েছে শুধু জল আর দু-চারখানা বিস্কুট, চা কয়েক কাপ।

এমন জ্বরে অপূর্ব মেজাজে রয়েছে আনন্দলাল।

মালকোশের মেজাজ।

সমস্ত রাত জ্বরে ঘুমোয় নি কাল রাত্রে।

ভোরে উঠে গুনগুন করে ধরেছে স্বরের আমেজ।

ফিরে ফিরে মধ্যমে আসা, ধৈবত-নিখাদের বেদনা-বহ্নি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার ফিরে আসতে হয় মধ্যমের মধুরে।

রাগের রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে আনন্দলালের চোখের ওপর।

বললে কজনকে,—গাও। গাও মালকোশ গাও।

ছাত্ররা ভাবলে মাস্টারমশাই বিকার বকছে।

পান্নালাল।

দোকানের সওদা সেরে থাঁদুর জিম্মায় রেখে সন্ধ্যায় এল শশিনাথ।

আনন্দলাল এপাশ ওপাশ করছে তখনও।

—কে ?

—আমি। শশিনাথ ভাবলে মাতাল হয়েছে আনন্দলাল।

তাকাল আনন্দলাল। চোখ দুটো লাল।

নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে।

তবু ভেতরে এল শশিনাথ। পাশে বসল।

—কে শশিনাথ ?—চিনতে পেরেছে আনন্দলাল।

শশিনাথ চুপ করে থাকে।

আনন্দলাল বলে শশিনাথকে, গাও ভাই। মালকোশ গাও।

শশিনাথ তখনও ভাবে এসব মাতালের প্রলাপ।

চুপ করেই থাকে।

ঘরের চারদিকে তাকায়।

লক্ষ্য করে কলাইয়ের গেলাসের দিকে। পায়ের কাছে কম্বল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে আনন্দলাল, একটু কেমন কেমন মনে হয় ওর।

খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে পড়ে থাকে আনন্দলাল।

আবার নিজেই ধরে মালকোশের আলাপ।

—জীবন ভোর হয়ে এল শশী। তাই শেষ রাতের গান ভালো লাগছে। আর বাঁচব না জানি, তাই জীবনে মালকোশের সুর দেখা দিয়েছে। অনেক অনেক কথা মনে হচ্ছে ভাই—।

শশিনাথ চমকে ওঠে—আমি আর বাঁচব না! বলে কি ?

—কি হয়েছে আপনার ?

গায়ে হাত দেয়। কপালে।

গরমে হাত জ্বলে যায়। এত জ্বর—আর এমন করে পড়ে ছটফট করছে!

—বড্ড অল্প বয়েসে একশ বছর পেরিয়ে গেছি মনে হয়। বয়েস আমার সাঁইতিরিশ, বিশ্বাস করো। কিন্তু সাতানব্বই বছরেও মানুষ এত ভোগ

করে উঠতে পারবে না। ঘেন্না ধরে গেল ভাই। সব বাজে। সব ঝুটো।

শশিনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

আনন্দলাল আপন মনেই আবার আলাপ ধরেছে। ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে রাগ মালকোশের নির্ভুল সুরস্পন্দনে। বেদনাবিন্দু ঝরে পড়ছে বুঝি।

—সবাই চলে গেছে! তুমি চলে যাও শশী।

শশিনাথ কেমন একরকম হয়ে যায়।

কি করে ও আনন্দলালকে ফেলে যাবে?

আনন্দলাল জানে না শশিনাথ আনন্দলালকে কত শ্রদ্ধা করে, কত ভালোবাসে। এর ভেতর হয়তো বা ঝুটা কিছু নেই।

চুপ করে বসে থাকে। একসঙ্গে অনেকগুলো কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে ও পারে না। ওর স্বভাবটাই তেমন নয়।

শুধু বলতে পারে,—একটু জল খাবেন মাস্টার মশাই?

আনন্দলাল আরক্ত নয়নে তাকায়। শশিনাথের স্বরের স্নিগ্ধতা ওকে কোথায় যেন নিয়ে চলে। কোথায়—অনেকদূরে। ছায়াঘেরা এক ঘরের দাওয়ায়।

—এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিতে পারো। খুব ঠাণ্ডা।—আপন মনেই বলতে থাকে আনন্দলাল। অনেকদিন আগের এক ঠাণ্ডা জলের স্বাদ ও ভোলে নি। ভোলা যায় না। ভেতরে অনেক জ্বালার ওপর প্রলেপ পড়েছিল সেদিন। আজ বুঝি সেই তেষ্টার বিকার।

শশিনাথ গেলাসটা শিয়রের কাছ থেকে নিয়ে জলের খোঁজে যায় ঘরের বাইরে।

বারান্দায় বসে ঠাকুর আটা মাখছিল। রাত্রে বাবুদের রুটি হবে।

এক গেলাস জল দাও তো বাবা।

মুখের পানটা বাঁ গালে টেনে পুঁটলি করে ভাঙা গলায় ঠাকুর বলে,—কলে আছে।

সামনে এক বড় ট্যাঙ্কের নীচে কল।

এক গেলাস জল ভরে নিয়ে ঘরে ঢোকে শশিনাথ।

ঘরে ঢুকে দেখে শশিনাথ একখানা রুমাল কপালে বাঁধবার চেষ্টা করছে আনন্দলাল।

—ছিঁড়ে পড়ছে ভাই। আর পারছি না।

শশিনাথ জলের গেলাস সামনে বাড়িয়ে দেয়।

গেলাসটা নিয়ে চুমুক দেয় আনন্দলাল।

—নাঃ! তেমন ঠাণ্ডা নয়!

জলটা বারান্দার দিকে ফেলে দেয় ও।

আবার শুয়ে পড়ে। এপাশ ওপাশ করে দু-চার বার।

মেসের সংকীর্ণ বারান্দার সামনে অনেকটা আকাশ, কয়েকটি পাণ্ডুর নক্ষত্র দেখা·যাচ্ছে। সামনে পূর্ণিমা। আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে। বেশ বড় চাঁদ।

দুটো আলো ঝিকমিক করতে করতে গুরুগর্জন করে একটা উড়োজাহাজ চলে যায়। আনন্দলালের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়,—শশী, তোমরা বৈষ্ণব?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—গলার তুলসী কণ্ঠীতে একবার হাত বুলিয়ে নেয় শশিনাথ।

—সব বৈষ্ণবই কি এমন মিষ্টি কথা বলতে জানে? তোমাদের কথা কত মধুর!

—ছোটবেলা থেকে এমনি শিখেছি।

—জোরে কথা বলতে জানো না? মারতে জানো না?

—বাবা বলতেন, সয়ে যেতে। যে সয় সেই রয়।

—ভুল বলতেন। কতক কতক লোককে মারা দরকার হয়।

—কি বলছেন আপনি!—শশিনাথের একটু কেমন কেমন বোধ হয়।

—এই ধরো না, আমার মতো লোককে।

—কি যে বলেন, আপনার মতো মানুষ কটা হয়।

—আমি ভালো লোক নই ভাই!

—ভালো লোক না হলে কি অমন গান গাইতে পারেন ?

—ভালো লোক হলেই কি গান গাইতে পারা চাই ! ইচ্ছে হচ্ছে ভালো হতে কিন্তু সত্যি কথা বলি তোমায়— এবারের অসুখে বড় ভয় হচ্ছে।

—ভয় আবার কি ?

—আর বোধ হয় বাঁচব না।

—ও আপনার মিথ্যে ভয়।

—সত্যি ! এমন অসুখ তো কত হয়েছে। চোদ্দ আউন্সে না হলে চব্বিশ আউন্স মদ খেয়েছি, সেরে গেছি, কিন্তু এবার মদ খেতে পারলুম না।

—ভালোই করেছেন। আর কথা বলবেন না।

আনন্দলাল বলে,—না, আর কথা বলব না। এত কথা কেউ আমার মুখে কখনও শোনে নি। তোমাকে খুব ভালো লেগে গেছে, তাই বলতেও ভালো লাগল।

শশিনাথ চুপ করে থাকে।

—এবার তুমি যাও।

শশিনাথ ইতস্তত করে বলে,—আমি না হয় আজ রাতটা থেকে যাই

—না, তুমি যাও। কটায় ট্রেন ?

—সাড়ে আটটা। তবে আপনিও না হয় আমাদের বাড়ি চলুন না? যদি জ্বর নিয়ে যেতে পারেন। খাঁদু আর আমি দুজন আছি, কষ্ট হবে না।

আনন্দলাল চুপ করে শুয়ে থাকে।

—যাবেন ? অসুখ সারলে আবার না হয় চলে আসবেন !

আনন্দলাল ফিরে শোয়, শশিনাথের দিকে তাকায়।

বলে,—তোমাদের আবার কষ্ট দেব ! অনেককেই কষ্ট দিয়েছি।

—তা হোক। আপনি চলুন।

ঠাণ্ডা ছোট্ট গ্রামটির কথা মনে হতেই মনটা যেন শান্ত হয়ে আসে আনন্দলালের।

—তবে বালিসের তলা থেকে ব্যাগটা বার করো। কিছু টাকা আছে, তোমার কাছে রাখো। আর কাপড়জামাগুলো নিতে হবে।

বলে নিজেই ব্যাগটা বার করে শশিনাথের হাতে দেয়।

—তানপুরোটা নিও।

শশিনাথ ওঠে। একে একে সব গুছিয়ে নেয়।

একটা ট্যাক্সি ডেকে এসে আনন্দলালকে ধরে ধরে তোলে। স্টেশনে অপেক্ষা করছে খাঁদু দোকানের জিনিস নিয়ে।

ট্রেনে আনন্দলাল চুপ করে থাকে, একটা কথাও বলে না। ও যেন কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। স্টেশনে পৌঁছে গোরুর গাড়ি করে যেতে হয় শশিনাথের বাড়ি!

খাঁদু অনেকবার বলেছিল ওদের বাড়ি যেতে। শশিনাথ শোনে নি। আনন্দলাল তার বাড়িই যাবে।

বাড়ি এসে শশিনাথ ডাকতেই ছুটে আসে রূপমঞ্জরী, সরমা। শশিনাথের আসতে দেরি দেখে ওরা বাইরে বসে অপেক্ষা করছিল।

আনন্দলালকে ধরে ধরে নামায় শশিনাথ। সরমাকে বলে,—মাল-পত্তরগুলো নামাও। মঞ্জরীকে বলে,—একটা বিছানা করে দে, বাইরের ঘরে এখুনি।

রূপমঞ্জরী খোলা মাঠে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পায় আনন্দলালকে।

আনন্দলাল তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রূপমঞ্জরী। একটু অবাক। একটু বা বিরক্ত।

না, ওটা আনন্দলালের ভুল।

বিরক্ত হয় নি রূপমঞ্জরী।

ওরা বৈষ্ণব। ওরা বিরক্ত হতে জানে না।

শশিনাথ বলেছে, ছোটবেলা থেকে রাগ শেখে না ওরা।

মঞ্জরী ভেতরে চলে যায়।—বিছানা করবে।

আনন্দলাল এসে বসে সেই বাইরের ঘরে।

মঞ্জরী বিছানা পাতছে তাড়াতাড়ি।

একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছে ঘরের এক কোণে।

শশিনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দোকানের মালগুলো ঠিক করে তুলতে হবে। কাঁচের জিনিস আছে অনেক। ভেঙে না যায়!

সরমা আছে মালপত্তরের সামনে দাঁড়িয়ে।

গাড়োয়ান মাল নামিয়ে রাখছে রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর।

বিছানাটা পেতে মঞ্জরী বলে,—শুয়ে পড়ুন।

আনন্দলাল নীরবে শুয়ে পড়ে বিছানার ওপর।

মঞ্জরী একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে।

আনন্দলালের গলা শুকিয়ে এসেছে। ঘাম হচ্ছে।

মঞ্জরী বলে,—আর কি দেব?

আনন্দলাল তাকায়। মঞ্জরী দেখে ওর চোখ দুটো রাঙা!

কপালটা চেপে ধরে বলে আনন্দলাল,—এক গেলাস ঠাণ্ডা জল।

মঞ্জরী চোখ নামিয়ে চলে যায়।

একটু পরেই এক গেলাস জল হাতে নিয়ে ঢোকে।

একটা ছোট পাথরের রেকাবিতে এক টুকরো মিছরি।

আনন্দলালের সর্বশরীর জুড়িয়ে আসে যেন।

মিছরিটুকু চিবিয়ে জল খায় আনন্দলাল।

ঠাণ্ডা শীতল জল।

দেহ মন স্থির হয়ে আসে। প্রতিটি স্নায়ু শিরশির করে নরম হয়ে আসে।

আনন্দলাল একটা নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ে।

মঞ্জরী গেলাস রেকাবি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

যাবার সময় দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

মালপত্র গোছগাছ করে বসেছে শশিনাথ। বলছে সরমাকে,—

—কি করবো বল! মেসে পড়ে তো মরবে। কেউ দেখবার নেই। মা নেই, বাবা নেই, তিন কুলে কেউ নেই। নিয়ে না এলে পাপ হবে যে!

সরমা বাতাস করছিল শশিনাথকে। বলে,—বেশ করেছ।

রূপমঞ্জরী এসে দাঁড়ায়।—খুব অসুখ নাকি দাদা?

মনে তো হল। কাল ইস্টিশন থেকে ডাক্তার আসবে। তবে বোঝা যাবে।

সরমা বলে,—আচ্ছা, ও মেসে পড়ে থাকে কেন? বিয়ে-থা করে ঘর করলেই তো পারে!

—কে জানে! ওই একরকম মানুষ! গান শিখিয়ে আড়াইশ টাকা রোজগার তো করেই। সব উড়িয়ে দেয়। এই ব্যাগটা ভালো করে রাখো। এতে ওঁর টাকা আছে।

সরমা ব্যাগটা হাতে নেয়।

মঞ্জরী ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে এসেছে।

রান্নাঘরে এসে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

আনন্দলালের জন্যে মনটা ওর একটু নরম হয়। দেখবার কেউ নেই। বউ নেই, তা বলে আত্মীয়স্বজনও কি কেউ থাকতে নেই?

দুধটা বাটি থেকে কড়ায় ঢালে। উনুনে চড়িয়ে দেয়।

আনন্দলালের জন্যে দাদা-বৌদির যেন ব্যস্ততার অন্ত নেই! বৌদির ব্যস্ততার কি অন্য কোন কারণ—আছে? বৌদির ভাবটাই একটু কেমন কেমন মনে হয় মঞ্জরীর।

একটু বিরক্তি আসে মনে।

কারণটা না বোঝবার মতো বয়েস নেই মঞ্জরীর।

দুধটা উথলে পড়ছে উনুনে।

ফুঁ দিতে দিতে হাতা নাড়ে মঞ্জরী।

সরমা ঘরে ঢোকে।

একটু হেসে বলে,—চলে এলে যে বড়?

একবার তাকায় মঞ্জরী। একটু হাসে।

মাস্টার মশাই বার্লি খাবেন। দুধ-বার্লি।

মঞ্জরী বলে,—বার্লি কোথায়? বার করে দাও।

সরমা বলে,—যাও নিয়ে এসো তুমি। খাটবে তুমি। আমি কেন খাটতে যাব।

—ঠাকুরঘরে একেবারে ওপরে মাচায় একটা ধামার ভেতর আছে।

—কোথায় যে কি রাখো!—বলে দুধটা নামায় মঞ্জরী।

বার্লি নিয়ে আসে ঠাকুরঘরে গিয়ে।

সরমা আটা নিয়ে বসেছে। রুটি হবে।

সরমা মঞ্জরীর দিকে তাকায়। বলে,—মাস্টার কিন্তু বামুন!

—তাই নাকি?—বলে মঞ্জরী, যেন কথাটা পাড়বার কোন মানেই বোঝে নি ও।

—হঁ্যা, আর বিয়ে-থা করে নি।—বিয়ে-থা না করলে কে ওঁকে দেখে বলো?

মঞ্জরী হাসে,—কেন, তুমি আর দাদা দেখবে।

—আর তুমি?

—আমি তো তোমাদের খাতিরে যত্নটুকু করি।

—নিজে থেকে কিছু করতে ইচ্ছেও হয় না?

—না।

—মিছে কথা।

—মিছে কথা আমি বলি না! যাকগে আগে রুটি করবে, না বার্লি হবে?

সরমার অত্যুৎসাহ নিষ্প্রভ হয়ে আসে, বলে,—বার্লিই করো।

মঞ্জরী বার্লি জলে গুলে কড়ায় ঢেলে উনুনে চড়িয়ে দেয় আবার।

সরমা কথা বলে না আর।

মঞ্জরীও কথা বলতে চায় না।

বার্লি রেঁধে বাটিতে ঢেলে বলে,—যাও খাইয়ে এসো।

সরমা বলে,—খুব যা হোক,—বাড়ির বউ যাবে, না—মেয়ে যাবে? তুমি যাও।

—বেশ।

বার্লি দুধ দুটো বাটিতে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে আসে মঞ্জরী।

এসে দেখে আনন্দলাল ঘুমোচ্ছে।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। যন্ত্রণায় ছটফটানি কমে গেছে নিশ্চয়ই। যে মানুষ খানিকক্ষণ আগে যন্ত্রণায় ছটফট করছিল সে এত আরামে ঘুমোতে পারে কি করে?

একটু অবাক হয় রূপমঞ্জরী।

বাটি দুটো ঢেকে রেখে বাইরে চলে আসে।

দাদার ঘরে যায়।

শশিনাথ দোকানের জিনিসগুলোর হিসেব করছিল।

মঞ্জরী বলে,—ভদ্দরলোককে ডেকে দাও! ঘুমুচ্ছে যে! কিছু খাবে না?

—ঘুমুচ্ছে কিরে!—শশিনাথও কম অবাক হয় না।

তারপর বলে,—তবে না হয় এখন থাক। যন্ত্রণায় যা কষ্ট পেয়েছে! একটু ঘুমোক। কিছুক্ষণ পরে ডাকব।

—রাত তো অনেক হল?

—তা হল।—বলে জিনিসগুলো গোছাতে থাকে শশিনাথ।

—অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের কতদূর কি হল দাদা?

—ভালো কথা মনে করেছিস। কাল থেকে কয়েকদিন একটু ওদিকটায় নজর দিতে হবে। কেন সাধু ভাই বলছিল কিছু?

মঞ্জরী মুখটা নীচু করেই বলে,—হাঁ। ওর দ্বারা তো কিছু হবে না। সব তো তোমায় করতে হবে।

—তা হবে। কাল খাঁদুকে একটু উস্কে দিতে হবে। বড্ড মিইয়ে গেছে সব।

—টাকা কিছু উঠল?

—টাকা! ও উঠে যাবে? অষ্টপ্রহরের খরচার ভাবনা হবে আমাদের গাঁয়ে? কি যে বলিস?

কথাটার সঙ্গে মঞ্জরী একমত হতে পারে।

বিশ্বাস করাটাই যে ওদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে। নামের খরচা নাম জোগাবে। একি আজ থেকে শুনছে ওরা? মিথ্যে ভাবনা করতে কে চায়! টাকা তো আপনা আপনি আসবে। এমনি নিদারুণ নির্ভরতায় অভ্যস্ত ওরা। বিচার করতে যাওয়াটাই বোকামি এখানে। বুদ্ধিমানের মতো বিশ্বাস করতে হবে। শুকনো কাঠের মতো বিচারের খটখটি। বৈষ্ণব বিচার করে না। বিচারে রস নেই—নীরস শান্তি হয়তো বা পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা তা চায় না। বৈষ্ণব রসিক। ওরা রসের সন্ধান করে। বিশ্বাসের হিমেই তো রস জমে।

রূপমঞ্জরী মাথায় হাত দুটো ঠেকায়। গোঁসাইয়ের কাজ গোঁসাই দেখবেন। আমাদের ভাবনা কি?

—যা বলিচিস।—খুব খানিকটা হেসে নেয় শশিনাথ।

নিশ্চিন্ত। ভাই-বোন দুজনে। মুখের কথা নয়। আন্তরিক নিশ্চিন্তা ওদের মনে। এতে একটু চিন্তা আসবার ফাঁক নেই।

রাত বাড়ে। শশিনাথ জিনিসগুলো ঠিক করে একবার যায় আনন্দলালের কাছে। তখনও আনন্দলাল ঘুমোচ্ছে অঘোরে। শশিনাথ ফিরে আসে। খাওয়া মিটিয়ে নেয় ওরা। শশিনাথের চোখের ওপর পাতা ভারি হয়ে উঠেছে। নেমে আসে ঘুমে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি নেমে আসে স্নায়ুতে। না শুয়ে আর পারবে না ও।

যাবার আগে বলে যায় মঞ্জরীকে,—একবার দেখে আসিস মাস্টার মশাই উঠল কিনা?

শশিনাথ ঘুমোতে যায়।

মঞ্জরী বোঝে, দাদার শরীর এলিয়ে আসছে ভরদিনের খাটুনিতে।

সরমা আর ও খাওয়া সেরে নেয়।

সরমা পানের বাটা নিয়ে বসে।

মঞ্জরী বলে,—তুমি পানটা সাজো বৌদি, একবার দেখে আসি ওঘরে।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাইরের ঘরের দিকে এগোয়।

দ্বাদশীর দুধে-ধোয়া চাঁদ ঢেকে গেছে হালকা মেঘে। একটু মেঘ করেছে যেন পশ্চিমের কোণে।

মঞ্জরী আকাশের দিকে তাকায় যেতে যেতে।

ওটা ওর অভ্যেস।

ঘরে ঢোকে।

আনন্দলাল বিছানার ওপর বসে বসে সিগারেট টানছে।

মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চেপে ধরছে কপালের দুটো পাশ।

মঞ্জরী ঘরে ঢোকে।

—কিছু খাবেন? বার্লি রয়েছে ঢাকা। গরম করে আনব?

আনন্দলাল তাকায়।

চোখদুটো ওর রাঙা হয়ে উঠেছে আবার।

—গরম করবার কি দরকার! এমনিই দাও।

মঞ্জরী বার্লি আর দুধ মিলিয়ে মিষ্টি দিয়ে দুটো বাটিতে করে মিশিয়ে আনন্দলালের সামনে এগিয়ে দেয়।

আনন্দলাল আবার কপালের দুপাশ চেপে ধরে বাঁ হাতে।

বাটি ধরে চুমুক দেয়।

এক বাটি খেয়ে বলে,—আর না।

—আর একটুখানি আছে। এটুকু খেয়ে নিন।

মঞ্জরীর মিষ্টি কথাগুলো আনন্দলালের এত যন্ত্রণার ভেতরও ভালো লাগে। এমন করে বলা, এমন প্রাণ থেকে বলা আনন্দলাল বহুকাল শোনে নি।

এমন অসহায় অসুস্থ হলে মানুষের একজনের কথা মনে হয়। মাত্র একজন। তাকে আনন্দলাল বহুকাল আগে হারিয়েছে। সে মা।

মাকে সে কিছুই দিতে পারে নি। তবু এত বেশী পেয়েছে যে তাঁর কথা কেই বা ভুলতে পারে। এমন নিদারুণ রোগশয্যায় মা-কে কেন মনে পড়ছে কে জানে? আনন্দলালের জীবনে তো এমন বাষ্পীয় ভাব কখনও ছিল না।

নিজেই একটু অবাক হয় ও। একটু গভীর চিন্তা করে ও বুঝতে পারে, কেন মনে পড়ল, মনে পড়ত না। মনে পড়ে না। কারু কথা মনে পড়া, এ এক ভাবাবেশের দুর্বলতা। মনকে কখনও কাদার মতো নরম হতে দেয় নি ও।

ওকে নরম করে ফেলেছে রূপমঞ্জরী, আশ্চর্য মেয়ে এই রূপমঞ্জরী!

নিজে এত নরম। ওর কথা এত নরম। ওর চোখ এত নরম যে ওর কাছাকাছি বসে ভিজে যেতে হয়। কাদা হয়ে যেতে হয়!

মা-কে মনে পড়লেও বেশীক্ষণ মনে করতে চায় না আনন্দলাল। ওর তেমন স্বভাবই নয় যন্ত্রণাটা আবার বাড়ে।

আর এক বাটি দুধ-বার্লি চুমুক দিয়ে কিছুটা খাবার পরই পেটটা কেমন পাক দিয়ে ওঠে। ভেতরটা যেন গুলিয়ে যায় সব।

যা খেয়েছিল সবটাই বেরিয়ে আসে আবার গলা দিয়ে।

মাথাটা ঘুরোতে থাকে।

ঘেমে নেয়ে ওঠে আনন্দলাল।

দম ফেলতে পারছে না ও।

সরমা এসে দাঁড়ায়।

মঞ্জরী মুহূর্তে আনন্দলালের কাছে গিয়ে ওকে ধরে বসে।

নইলে হয়তো বা পড়েই যেত আনন্দলাল।

সরমার দিকে তাকিয়ে বলে,—শিগগির পাখাটা নিয়ে এসো বৌদি।

সরমা পাখা আনতে যায়।

আনন্দলাল মাথাটা খাড়া রাখতে পারে না। ঘরবাড়ি সব ঘুরতে থাকে, ওর মাথাটা নুয়ে পড়ে মঞ্জরীর কাঁধের ওপর।

মঞ্জরী গ্লাসের জলটা এগিয়ে নেয়।

মুখটা ধুইয়ে মুছিয়ে দেয়।

ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেয়।

সরমা পাখা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

মঞ্জরী পাখাটা হাত থেকে নিয়ে বলে,—এক বালতি জল নিয়ে এসো কুয়ো থেকে।

সরমা জল আনতে যায়।

মঞ্জরী আনন্দলালের জামা বার করে বাক্স থেকে।

ও জামাটা ধরে আস্তে আস্তে খুলে ভালো জামাটা পরায়। আবার ওকে শুইয়ে দেয়।

বাটি দুটো গেলাসটা একপাশে রাখে।

সরমা জল নিয়ে আসে।

ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটা বার করে সমস্ত ঘরখানা ধুয়ে ফেলে মঞ্জরী।

তারপর মুছে ফেলে।

বাইরে গিয়ে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে একটি গ্লাসে পরিষ্কার এক গ্লাস জল নিয়ে আবার ঘরে আসে মঞ্জরী।

আনন্দলাল তখন শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে।

ওকে জল খাওয়ায় মঞ্জরী। নিজে হাতে মুখে আস্তে আস্তে জল ঢেলে দেয়।

পাখাটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে থাকে।

বাইরের সজনে গাছটায় কিংবা বাগানের কামরাঙা গাছটায় অনবরত একটা পেঁচা ডেকে চলেছে। আকাশের মেঘ আরও ঘন হয়ে উঠেছে।

বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে।

দম নিতে কষ্ট হয়।

—কষ্ট হচ্ছে?—গলার স্বর যে এত নরম হয় এর আগে কি আনন্দলাল জানত?

ধীরে ধীরে বাঁ হাতটি কপালের ওপর রাখে মঞ্জরী।

কপালে হাত বুলিয়ে দেয় বাঁ হাতে। ডান হাতে পাখা চালায়।

আরও সময় কাটে।

আনন্দলাল চুপ করে পড়ে রয়েছে।

ওর মন বুঝি বলছে, অসুখ যে কারো জীবনে এত সার্থক হয়ে ওঠে আগে বুঝতাম না।

আনন্দলালের বিশ্বাস, এবার ও বাঁচবে না।

মরবার আগে হয়তো বা এমন বিন্দু বিন্দু জীবনানন্দ ক্ষরণ হচ্ছে এ জন্মের শেষ কটা দিনরাতের বিশুষ্ক ক্ষেত্রে।

এত যন্ত্রণাও অসহ্য মনে হচ্ছে না। হয়তো তাই।

আবার কানে আসে।

কানে আসে না, কানের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্নায়ুতে সুর তোলে।

—আপনি ঘুমোন।

ছায়ানটের মরমী আলাপ।

ছায়ানট সুর জাগে আনন্দলালের অন্তরে। অন্তরের গভীরে।

ছায়ানটের রূপ জাগে। মোহাতুর নীলঘন মূর্তি। ঋষভ পঞ্চমের মধু গুঞ্জরণ।

এমন আলোর মত রূপ কখনও দেখেনি আনন্দলাল।

বিকীর্ণ নীলাভ আলোয় বুক ভরে যায়। চোখের পাতা নেমে আসে।

মঞ্জরী অতি সন্তর্পণে পাখা নামায়।

আনন্দলাল ঘুমিয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

ছায়ানটের সুর স্বপ্নে বিলীয়মান হয়ে আসে।

নীলাভ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে ওর মন।

অফুরন্ত আকাশ। দিগন্তের নীল রেখা—বোধহয় বনরেখা।

শুধু মধু! মধু!

মঞ্জরী খুব ধীরে ধীরে ওঠে।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরোয়।

বাইরে এসে দাঁড়ায়।

মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে শিরশির করে ওঠে গা।

দু-একটা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে।

ঘরের দোরটা ভেজিয়ে দেয় মঞ্জরী।

একটু সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে।

যদি জেগে ওঠে আনন্দলাল? যদি ভেতর থেকে কোন শব্দ আসে?

না। কোন সাড়া নেই।

মঞ্জরীর অভ্যাস, তাই আর-একবার আকাশের দিকে তাকায়।

আসন্ন বর্ষণের শঙ্কায় আকাশ থমথমে।

উঠোনটা পেরিয়ে নিজের ঘরে চলে আসে মঞ্জরী।

দুদিকে দড়ি বেঁধে টাঙানো বাঁশের ওপর থেকে নিজের কাঁথাটা পাড়ে।

পেতে নেয়। বালিশটা নেয়।

দোরটা বন্ধ করে।

ঘুম আজ আর হবে না।

কান খাড়া করে রাখে বাইরের ঘরের দিকে।

হঠাৎ যদি উঠে পড়ে। ভয় পায়। জল তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যায়।

বলা যায় না যদি প্রাণটা বেরিয়ে যায়!

দুহাত জোড় করে মাথায় ঠেকায় মঞ্জরী।

নিজেকে সেই নীলঘন কিশোরের কচি দুটি পায়ের ওপর ছড়িয়ে দেয়।

একটা বড় নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

শুয়ে পড়ে মঞ্জরী

উমা মল্লিক কাঁদছে। অঝোরে কাঁদছে। আনন্দলাল চলে যাবার পর থেকেই এবার ওর মন ভালো ছিল না। আসতে বারণ করেছিল, অপমান করেছিল। আঘাত করেছিল। কেন যে করেছিল আনন্দলালও কি জানে না?

কিছুদিনের ভেতর চাকরকে দিয়ে মেসে খবর করেছিল। শেষ খবর এসেছে আজ। আনন্দলাল চলে গেছে। জ্বরে ভুগছিল দুদিন ধরে। জ্বর নিয়েই চলে গেছে। কোথায় গেছে মেসে কেউ জানে না। তাদের টাকা পাওনা নেই; তাদের জানবার দরকার নেই। কিন্তু উমা মল্লিকের পাওনা

কিছু নাই বা থাকল। দেনা তো আজও শোধ হয় নি। জীবনে যে এ দেনা শোধ হবার নয়!

অসুখের ভেতর আনন্দলাল কি আর একবার তার কাছে আসতে পারত না? এসে না হয় দেখত উমা কি করে? উমাকে কি এখনও চিনল না ও?

হয়তো বা অভিমানে আসে নি। কোথায় গেল অসুখ নিয়ে, কী হল কে জানে? অসুখটা নাকি এবার খুব বেশী হয়েছিল। দিনরাত্রি ঘুমোত না। যদি কিছু হয় ওর?

ভাবতেই উমা মল্লিকের বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়। এত ঘৃণা, এত বিষ জল হয়ে গলে পড়ে চোখের কোন্ বেয়ে। চিরকাল কষ্ট দিচ্ছে, তবু কষ্ট পেতে যে এত ভালো লাগে উমা নিজেও হয়তো বা জানত না।

এম. এ. পাশ করে আজ ও কত বড় ঘরের বউরানী হতে পারত। রূপ আর রুপোর অজস্র সম্পদ নিয়ে এসেছিল কত পুরুষ। আসতে পারত কত পুরুষ। উমা তাদের চায় নি। এই হতভাগা মানুষটার প্রাণঢালা গান তাকে পাগল করেছিল। সব ত্যাগ করেছিল এক দিনে।

মায়ের কথা আজও মনে হয় উমার। বড় ভাইদের কথা। তারা আজ কত বড় বড় চাকুরে। বিয়ে করেছে কত বড় বড় ঘরে। তাদের যে এক বোন ছিল, তার নাম ছিল উমা। -এ কথা আজ স্বীকার করতেও লজ্জা পাবে তারা। কাছে গেলে চিনবে না, ইচ্ছে করেই চিনবে না। এক নেশাখোর জুয়াড়ী গাইয়েকে এত বড় বংশের মেয়ে যে স্বামী বলে স্বীকার করে নিতে পারে, এ তাদের স্বপ্নেরও বাইরে ছিল।

মা মরে গেল। উমার শোকে মরল কিনা উমা জানে না। তারপর আর কখনও যায় নি মায়ের কাছে। মা-ও ডাকে নি। মেয়েটাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনের ওপর শরীরের ওপর অযথা চাপ দিয়েই হয়তো বা মরে গেল। আঘাত পেয়ে মনকে বশে আনতে যাওয়া কত বড় বোকামি।

মন কি বশে আসে? মায়ের অভিশাপেই বোধ করি উমাকেও আঘাত

পেতে হল। আজও ও মনকে বশে আনতে পারে নি। মনকে ভুলতে বললে বলে,—ভালো কথা মনে করিয়ে দিলি। আরও জপতে থাকে তার নাম। আর দেখতে থাকে তার রূপ।

মনের এ এক বিচিত্র স্বভাব। মনে করব না বললেই আরও বেশী মনে হয় আর মনে করতেই হবে বললে সেটা ভুলতে দেরি হয় না।

উমা মল্লিক আজও তো ভুলতে পারে নি। ভোলবার চেষ্টাও করে না। চেষ্টা করলে আরও বেদনা। মনের কাছেই মনকে সমর্পণ করে। যা মনে হবার হোক কে অত খোঁজ রাখতে চায়!

তাতেও হয় না। এত করেও সংসারের এক অতি হতভাগার জন্যে তার চোখের কাজল ধুয়ে যায়। বুকে ভাঙন ধরে।

অনেকক্ষণ শুয়ে পড়ে থাকে উমা। সন্ধ্যা উতরে গেছে। আলো জ্বালতেও ভালো লাগে না। অবশ হয়ে আসে সর্বশরীর।

চুপ করে পড়ে থাকতে হয়।

অনেক কাঁদবার পর নিজেকে হালকা মনে হয়।

মাথাটায় একটু যন্ত্রণা হয়।

চাকররা গেছে বায়স্কোপে।

আসতে পোনে নয়টা। তারপর রান্না।

কী হবে আর রান্না?

বাসা ছেড়ে ও চলে যাবে কোথাও।

আর কী হবে কাছাকাছি থেকে?

আর কার খোঁজ করতে মাঝে মাঝে অধীর হয়ে উঠবে?

বাইরে কোথাও প্রফেসারি নিয়ে চলে গেলেই ভালো হয়।

জীবনের ওপর সাময়িক বিতৃষ্ণা আসে যেন।

বুড়ো হয়ে গেল উমা মল্লিক।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে বুড়ো হয়ে গেল?

দোরে ঘা পড়ে।

একটুও চমকায় না উমা।

ও জানে কে এসেছে। কে আসতে পারে।

উঠতেও ভালো লাগে না।

স্তাকামি শুনলে মাথা ধরা বেড়ে যাবে আরও।

আবার ঘা পড়ে দরজায়।

উঠতেই হয়। আলোটা জ্বালায়। দোরটা খুলে দেয়।

এসেছে। সুশান্ত হালদার।

বড় বড় অসহায় চোখদুটো মেলে তাকায়। একটু যেন ভয় পেয়েছে। —বিরক্ত করলাম ?

—করলেনই তো ?—তবু হেসে বলতে হয় উমাকে।

সুশান্তর স্বরটা বড়ই মেয়েলী,—আমার অপরাধ হয়েছে।

উমাকে আবার হাসতে হয়।

একটু মায়াও লাগে। এত অসহায় এই সুশান্ত হালদার !

—বিরক্ত যখন করেছেন, তখন বসতে হবে।—বলে উমা।

—না, আজ বরং থাক।

—না বসুন।

চেয়ারটা টেনে দেয় উমা।

সুশান্ত বসে। তাও যেন ভয়ে ভয়ে।

—হাতপা ছড়িয়ে বসুন। অনেক কথা আছে।

এবারে সত্যিই ভয় পায় সুশান্ত,—কথা ? আমার সঙ্গে ?

—কথা মানে গল্প। অনেক গল্প করব আজ।

—অ !—এবারে একটু হতাশ হল সুশান্ত। কথা থাকলেই যেন ভালো ছিল।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে সুশান্ত,—একটু যেন কেমন ইয়ে মনে হচ্ছে আপনাকে ?

—শরীরটা তেমন ভালো নেই।

—কেন ?

—কি আশ্চর্য, শরীর কি খারাপ হতে নেই।

—অ!—সুশান্ত হালদার এক টিপ নস্যি নেয়।

খুব ময়লা রুমালটায় নাক মোছে।

আর-এক পকেট থেকে পরিষ্কার রুমালটা বার করে ঘাড়ি আর কপাল মোছে।

ফাল্গুনের সন্ধ্যায় গরম বড় একটা থাকে না। মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বইতে থাকে। আজ কিন্তু বাতাস বন্ধ।

ঘেমে উঠছে সুশান্ত হালদার।

কখনও যা বলে নি, হঠাৎ বলে উমা,—আনন্দলালের গান আপনার কেমন লাগে?

সুশান্ত ভাবে এটা হয়তো আলাপের একটা অছিলা,—ভালোই লাগে।

—সত্যি ভালো লাগে?

—হাঁ, তবে লোকটা শুনেছি মদ খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

—সেটা আমিও শুনেছি। আপনি দেখেছেন তাকে কখনও?

—না, রেকর্ড শুনেছি।

—ওর সেই 'তোমার পায়ের ধুলো গিয়ে মেঘ হয়ে চাঁদ ঢাকে'—গানটা কেমন লাগে আপনার। নয়তো সেই 'সাতসাগরের পারে আছে—' কী-যেন! মনে পড়ছে না।

সুশান্ত একটু বিপদে পড়ে যায়,—বলে,—অত মন দিয়েতো গান শুনি নি।

হঠাৎ বিরক্ত হয় উমা,—তার মানে গান ভালো লাগে না আপনার। কি-রকম মানুষ আপনি! আনন্দলালের গান জানে না এমন মানুষ কটা আছে শুনি? আধুনিক গানে ক্লাসিক্যাল সুর কে মেশালে?

সুশান্ত বেশ ঘেমে ওঠে।

উমা নিজের মাথাটা টিপে ধরে। যন্ত্রণা হচ্ছে।

সুশান্ত একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে কথা পালটাতে চায়।—আচ্ছা 'সনাতন' পত্রিকায় রবিবাবুর সঙ্গে মিলটনের তুলনা করে যে লেখাটা বেরিয়েছে পড়েছেন?

—না।

—লেখাটায় একটা নতুন 'লাইট' পেলাম।

উমা নীরব।

সুশান্ত আবার বলে,—'মিউজিয়মে' একটা নতুন জিনিস দেখাচ্ছে। দেখেছেন ?

—না।

—আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ?

উমা ঘাড় মাড়ে—হ্যাঁ কি না বোঝা যায় না।

সুশান্ত উঠে পড়ে।

উমা বলে,—বসুন। চা আনি

—না, আজ না হয় থাক।

উমা আর সাধে না।

চাকরটা নেই। আবার নিজেরই চা করতে যেতে হবে! ভালো লাগে না।

উমা বলে, —আচ্ছা, বাইরে কোন কলেজে আপনার জানা-শুনো আছে?

—কেন বলুন তো ?

—মেয়েদের কলেজ হলেই ভালো হয়।

—কেন, আপনি বাইরে যাবেন ?

—যেতেও পারি। কলকাতা ভালো লাগছে না আর।

সুশান্ত ভাবে একটু। বলে,—একটু ভেবে বলব। এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

উমা বলে,—যদি একটু খোঁজ দেন, বড় উপকার হয়।

সুশান্ত বিদায় নেয়।

উমা দোর বন্ধ করে। আলোটা নিভিয়ে দেয়।

আবার এসে শুয়ে পড়ে বিছানার ওপর।

সুশান্তর জন্যে একটু মায়া লাগে।

কতদিন ধরে আসছে। আজও এল।

ভালো লাগলে উমা কথা বলে। ভালো না লাগলে কথা বলে না।

তাতে একটুও অভিমান নেই লোকটার।

এত বড় বিদ্বান হয়ে মাত্র একটা সাধারণ কথা বলবার জন্যেই সুশান্ত এতদিন ধরে আসছে।

উমা জানে। মনে মনে বোঝে।

কিন্তু কথাটা সুশান্ত কিছুতেই বলে উঠতে পারছে না।

এত ভীতু লোকটা! এত বড় পণ্ডিত হয়ে এত ভীতু হয়?

আশ্চর্য লাগে উমার।

আনন্দলাল যদি হত। এক মুহূর্তও লাগত না ওর ভালোবাসার কথা বলতে। খুব হাসতে হাসতে বলত। খুব হালকা হয়ে বলত, যেন হতে পারে সত্যি, হতে পারে তামাসা। তামাসাই বটে!

আনন্দলালের সমস্ত জীবনটাই তামাসা।

ও সংসারটাকে এক তামাসার রঙ্গভূমি বলেই ভাবে।

চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস, গোপন কথা, সব প্রচুর হাসির ভেতরে উড়িয়ে দিতে পারে ও। কিছুরই খুব ভীষণ কিছু মানে নেই ওর কাছে।

জীবনেরও নয়।

তাই তো উমার ভয়। অসুখ হয়ে রাস্তায় পড়ে মরে থাকবে, হাসতে হাসতেই মরবে।

ক্ষোভ কাকে বলে জানে না জীবনে।

অদ্ভুত আনন্দলাল। উমার আনন্দলাল। ও আর কারও নয়। আর কেউ ওকে জানে না। ও একান্ত উমার।

আবার চোখদুটো ভিজে ওঠে ওর।

জানালা দিয়ে এতক্ষণে ঝিরঝিরে বাতাস ঘরে ঢোকে।

বালিসটার ওপর ভালো করে মুখটা রাখে উমা।

ভাবে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটাও বোধ হয় ওর ঠিক হবে না।

যদি আনন্দলাল আসে। কখনও যদি আসে।

প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে ওর। অন্তত একটা বছর।

তারপর যা হোক কিছু করবে। কী করবে এখন ভাবা যায় না।

ভাবতে পারে না।

১০

আগের দিন শুভ অধিবাস। অষ্টমপ্রহর নামসংকীর্তনের অধিবাস। গোসাইয়ের কুটিরে সন্ধ্যা থেকেই ভিড় হয়েছে। শশিনাথ আজ দোকান থেকে ফিরেছে সকাল সকাল। থাঁদু আজ আবার কলকাতায় যায় নি। পাঁচ গাঁয়ের উঁচু ঘরের কর্তারা এসেছেন। সবাই বৈষ্ণব। বড় বড় তিলকের বাহার। তিন-চার ভাঁজ কণ্ঠী। কারও কারও হাতে মালার থলে। সাদা ছোট ছোট থলে।

খোল এসেছে আজ এক জোড়া। এসেছে করতাল সাত-আট জোড়া। বড়ঃকরতাল দুটি। বেল ফুলের মালা, গাঁথুনির ভেতর দুচারটে হলুদ চাঁপা গাঁথা। একটি মোটা মালা—দু-চারটে করে গোলাপ গাঁথা।

সামনে ফাঁকা স্থানটুকু পরিষ্কার করা হয়েছে। ওপরে টাঙানো হয়েছে মোটা চট। বাঁশের খুঁটি। খুঁটিতে টাঙানো হরের্নাম শ্লোক। কোথাও বা পিচবোর্ডের ওপর কাগজে লেখা 'তৃণাদপি সুনীচেন' সংস্কৃত গাথা। কোথাও বা 'নাম্নামকারী বহুধা' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যর সুরচনা।

মাঝে বসানে হয়েছে একটি তুলসীমঞ্চ। চারদিকে লাল সালুর কাপড়ে ঢাকা। বৃন্দারানী সেজেছে নতুন শাড়িতে। তুলসী—ওরা বলে বৃন্দারানী—গলায় দুলছে তার মোটা মালাটি। মাঝে মাঝে গোলাপ গাঁথা।

তুলসীমঞ্চের নীচে চারকোণে চারটি পট। নদীয়ার পথে ভগবান চৈতন্যনিতাই। পতিতপাবন সীতারাম। রাসপূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণ মিলন-বাসর। হরপার্বতী বসেছেন হিমাচলে। চারটি পট।

নীচে একটি বেদীর ওপর পঞ্চতত্ত্ব। পঞ্চতত্ত্বের নানা উপচারে পূজা। ছয় গোস্বামীর আরাধনা। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস।

নানা ভোগ-রাগের ব্যবস্থা করা হবে। পঞ্চতত্ত্বের প্রধান পূজা।

নীলকেশর মালা পরাচ্ছিল সবাইকে একে একে। এ উৎসবে ফুল-চন্দন-মালা প্রধান। নীলকেশর ছোট একটি বাটিতে সাদা চন্দন আর বড় গন্ধরাজ ফুল হাতে নিয়ে সকলের কাছে আসে। সকলের কপালে ফুলটি চন্দনের বাটিতে ডুবিয়ে চন্দন পরিয়ে দেয়। এ প্রসাদ সবাই পায়। মালী ঢুলি ভিখারীও একটি করে চন্দনের ফোঁটা পায় নীলকেশরের হাতে।

নীলকেশরের টানা টানা চোখ দুটো একটু রাঙা—বোধহয় উপোসে, আর আধবোজা—ভাবাবেশে।

মনটা যে কোথায় উঠে গেছে!

কাউকে বড় কাউকে ছোট মনে হয় না আজ।

এত মানুষ!

সবাই তো নিত্যকৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণ অন্তরে আছে যে সবারই। ওদেরও—যারা অতি সংকোচে হাত জোড় করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে ভয়ে। ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

ইচ্ছে হয় ওদের হাত দুটো বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে।

নিজের বুকে জড়িয়ে ধরতে বাসনা হয়।

বুকটা যেন আজ অনেক অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে।

নীরব অনুভব ওর।

কেউ জানে না যে বুকের ভেতরে ওর কত বিশাল কত বিরাট আকাঙ্ক্ষা জেগেছে আজ।

নীলকেশর স্তব্ধ হয়।

এ সব গোপন ভাব-সাধন।

একটা বছর সাতেকের বাচ্চা ছেলে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিল নীলকেশরের মালাটার দিকে।

বোধহয় খুব নীচু জাতের গরিব ছেলে।

নীলকেশরের বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে।

ঢেউয়ের তোড় সামলানো যায় না বুঝি।

অনেক কষ্টে ভাব সংবরণ করতেই হয়।

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো ভিজতে চাইলেও ভেতরে চেপে নীলকেশর মালাটা গলা থেকে খুলে ছেলেটার গলায় পরিয়ে দেয়।

ছেলেটা ভারী খুশী।

হরিবোল।

নাচতে নাচতে চলে যায় ছেলেটা।

শুভ অধিবাসের আর দেরি নেই।

সবাই বলেছে নীলকেশরকেই করতে হবে অধিবাস কীর্তন।

নীলকেশর কী গাইবে!

নিজেকে কেন যে এত ছোট মনে হয় জানে না নীলকেশর।

ওই যে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ছাগশিশু, ঘাস খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে, বেছে বেছে।

ওর চেয়েও কি বড় মনে করা যায় নিজেকে?

নীলকেশর নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আসনের ওপর বৃন্দারানীকে সামনে রেখে নামে বসতে হয়।

চোখ দুটো বুজে আসে।

সামনে বসে পাঁচ গাঁয়ের কর্তাব্যক্তিরা।

খোল নিয়ে বসে দুজন দুপাশে। করতালি আর খোলের ধ্বনি ওঠে প্রথম।

প্রণাম জানাতে হয়।

স্থাবর জঙ্গমের অতি সূক্ষ্ম কীটকেও প্রণাম জানাতে হয়।

সকলের কৃপা পেলে তবেই সব হল। প্রেম এল।

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেমকল্পতরু। অদ্‌ভুত যাঁর প্রকাশ।

গুরুবন্দনা করে নিতে হয়।

নিতেই হয়।

তারপর?

গৌরবন্দনা।

তারপর ?

নামকীর্তন শুরু, তারপর রাধে গোবিন্দ জয়।

অধিবাস কীর্তন এল আরও পরে।

শ্রীধর মুকুন্দে ডাকিয়া তখন কহিছে গৌরাঙ্গ হরি।
মনোহর বেদি কর নিরমাণ স্থান সংস্কার করি॥

তারপর ?

দধি ঘৃত মঙ্গল সবে ভেল উতরোল করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়ে মালা চন্দন কীর্তন মঙ্গল অধিবাস॥

চোখ দুটো আর খোলে না নীলকেশর।

খোল করতালের মৃদু শব্দ ক্রমশ তালে তালে বেড়ে চলে।

মধুর কলরব মাঠে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে।

দূর থেকে ঘরে ঘরে ভেসে আসে কলরব।

ভেসে আসে শশিনাথের বাইরের ঘরে।

দুলে দুলে ওঠে রূপমঞ্জরী বাইরের ঘরে বসে বসে।

ওর হাতে তালপাতার পাখা।

বাতাস করছিল আনন্দলালকে।

আনন্দলালের কাছে ও ছাড়া আর কেই বা থাকবে।

শশিনাথ বলেছিল,—তুই বরং যা, আমি থাকি।

রূপমঞ্জরী বললে,—তা কখনও হয়, তোমার ওখানে কত কাজ! আমি থাকি।

রইল মঞ্জরী। দেহটাই রইল যেন। মনটা কখন চলে গেছে নীলকেশরের কুটিরে ও নিজেও টের পায় নি। দেখতে পাচ্ছে যেন নীলকেশর পদ্মপাপড়ির মতো বড় বড় চোখ থেকে শিশিরবিন্দুর মতো জল ঝরে পড়ছে।

ভাবাবেশে আজ কি ডুবে যাবে না নীলকেশর ?

আর কাল ?

মঞ্জরী কাল একবার যাবেই।

কী করে যাবে? এখানে থাকবে কে?

না! যেতেই হবে। ভোর হবার আগে, কাক ডাকবার আগে যেতে হবে।

তখন কি আরম্ভ হয়ে যাবে নাম?

হলই বা। তবু তো দেখবে ও নীলকেশরকে।

নীলকেশরের ভাসা ভাসা চোখ দুটোয় আজকের ভাববিলাসের রেশ ভাসবে তখনও।

নিশ্চয়ই দেখবে ও অনেক আনন্দমন্থনের পর—স্নিগ্ধ মুখখানা নীলকেশরের। বাসি ফুলের গন্ধরেশ থাকবে তাতে।

—উঃ!

চমকে ওঠে রূপমঞ্জরী,—জল দেব?

জল দিতে হয় আনন্দলালের মুখে।

আনন্দলাল তাকায়, জ্বর কমে এসেছে। ঘামছে।

ক্ষীণ স্বরে বলে,—কিসের সুর? যেন ধানশ্রী, না, কামোদ! কোথা থেকে আসছে।

এমন অবস্থায়ও মানুষের সুর কানে আসে? সুরপাগল আনন্দলাল।

মঞ্জরী বলে,—আজ যে অধিবাস।

—কিসের?

—কাল অষ্টপ্রহর নামকীর্তন।

—কোথায়? কেমন নাম? তোমার মুখে যেমন শুনেছিলুম একদিন?

মনে আছে আনন্দলালের। গলাটা বড়ই ক্ষীণ, দুর্বল।

মঞ্জরী হাসে,—আমার মুখে ছাই! আমি আবার কী জানি?

—আজ অধিবাস!

নিজের মনেই বলে আনন্দলাল। একটু কান পেতে শোনে।

আবার বলে,—কি মিষ্টি সুর! অধিবাস!

ও বারে বারে এক কথা বলাতে মঞ্জরী বলে,—চুপ করে ঘুমোন একটু।

আনন্দলাল তাকাবার চেষ্টা করে ওর মুখের দিকে।

মঞ্জরী মাথাটা নামিয়ে ওষুধের শিশিটার ছিপি খোলে।

—ওষুধ থাক।

—তা কি হয়!—মঞ্জরী ওষুধ জল দিয়ে মিশিয়ে খাইয়ে দেয়।

আজ কদিন ধরেই জর একভাবেই রয়েছে।

ডাক্তার আসছে। ওষুধ আসছে।

শশিনাথ বলে,—সবই মাস্টারের টাকা। ওই ব্যাগ থেকেই খরচা হচ্ছে। নইলে শশিনাথ পারবে কোথা থেকে?

সেবার ভারটা মঞ্জরীকেই নিতে হয়েছে, প্রায় বাধ্য হয়ে।

ভালোই লাগে মঞ্জরীর।

ভাবে, এ তো তাঁরই সেবা। এতে তাঁরই কৃপা হবে।

সব কিছুই তাঁর। ওদের ভাববার ভঙ্গীটাই এই রকম!

আনন্দলাল ওষুধ খেয়ে বলে,—একটা কথা বলব?

—কি? মঞ্জরী পাখা হাতে নেয়। কান দুটো ওর বাতাসে-ভেসে-আসা সুরের দিকে।

—আশ্চর্য! একটু হাসে আনন্দলাল।

—কী আশ্চর্য!

—তুমি থাকলে অসুখের ব্যথা বেদনা কিছুই থাকে না। আশ্চর্য নয়?

মঞ্জরী একটু গম্ভীর হয়ে বসে,—আশ্চর্য নয়, এ তাঁরই কৃপা।

—তাঁর কৃপা জানি না, কিন্তু তোমার কৃপা জীবনে ভোলবার নয়। এত সেবা শোধ করব কি করে?

—এ সব কথা থাক।

—যা মনে হয়, বলতে ভয় হয় না! এ আমার চিরকালের স্বভাব।

মঞ্জরী নীরব।

—একটা কথা তুমি জান না।

মঞ্জরী কথা বলে না।

—তোমাকে যে দিন প্রথম দেখলাম, সে দিন যেন জীবনের মানে আবিষ্কার করলাম।

এত বড় বড় কথা মঞ্জরী বুঝতে চায় না।

চুপ করে থাকে।

—তোমার কোন দুঃখ নেই মঞ্জরী ?

মঞ্জরী পাখাটা জোরে চালায়।

হাসে, বলে,—কী আবার দুঃখ ! বেশ আনন্দে আছি।

—আমাকে তোমার কিছুটা আনন্দ ধার দেবে ?

মঞ্জরী হেসে ফেলে।

বলে,—ঐ শুনুন, অধিবাস কীর্তন বোধহয় শেষ হয়ে এল।

আনন্দলাল বলে,—হাসি নয়, কথাটা ভেবে দেখো।

মঞ্জরী বলে,—দেখব'খন পরে সময় পেলে। অধিবাস কীর্তন কোথাও শুনেছেন ?

—না।

—পদাবলী ?

—শুনেছি।

—পালা কীর্তন ?

—না।

—আহা, পালা কীর্তন শোনেন নি। আগেরবার কুঞ্জভঙ্গ পালা শুনলুম। আহারে, কি গাইলে ! গদাধর বাবাজীর কীর্তন !

—কোথায় শুনলে ?

—এখান থেকে তিন কোশ দূরে ময়ূরগঞ্জের বড় বাড়িতে।

—কুঞ্জভঙ্গ।

—হ্যাঁ, কুঞ্জভঙ্গ। সবচেয়ে ভালো লাগে আমার। ভর রাত কুঞ্জ বিলাসের পর ভোর হয়ে গেল। কেন ভোর হল ? সূর্য কেন তাড়াতাড়ি ওঠে ? আহা, গদাধর বাবাজীর দুচোখ বেয়ে জল পড়ে।

আনন্দলাল চুপ করে শোনে।

—কেন, আমাদের এখানেও হল রূপাভিসার, নৌকাবিলাস।

—শুনেছ ?

—হ্যাঁ। নৌকাবিলাস আমার ভালো লাগে।

—তাই নাকি?—আলাপের আরামে চোখ দুটো বুজে আসে আনন্দলালের।

—একবার ইচ্ছা হয়, মাথুর শুনব।

—শোন নি?

—না। মাথুর নাকি সবচেয়ে ভালো।

—কেন?

—তা আর হবে না! কৃষ্ণ গেলেন মথুরায়, শ্রীরাধার কী দশা! চোখে জল না এসে পারে?

—আমি বলি কি রাধা মথুরায় পালিয়ে যেতে তো পারত।

মঞ্জরী হেসে ফেলে,—কী যে বলেন? তাহলে আর বিরহলীলা হবে কী করে?

—ঠিকই বলেছ।

—মাথুর একবার শুনতেই হবে। তাঁর ইচ্ছে হলে হয়ে যাবে।

আনন্দলাল নীরব।

মঞ্জরী ওর মনের মতো কথা পেয়ে আর থামতে চায় না।

—একজন এসেছেন। কি মধুর গান তাঁর।

—কে?

—এক মহারাজ। আমার বাবার গুরুভাই।

—বুড়ো বুঝি?

মঞ্জরীর দৃষ্টিটা চলে গেছে অন্য কোথায় অন্য কোনখানে।

বলে,—বুড়োই তো! তা নইলে আর অত ঘন আবেশ হয়?

—পণ্ডিত বুঝি?

—পণ্ডিত বটেই। নইলে অমন লীলারস কী করে জানে?

—মহারাজের সঙ্গে মহারানী আছেন?

মঞ্জরী হাসে না, বলে,—হ্যাঁ, মহারানীর খোঁজেই তো এসেছেন।

—হারিয়ে গিয়েছিল নাকি?

—হ্যাঁ।

—পেয়েছেন ?

—এইবারে খোঁজ পেয়েছেন।

—যাকগে।

—তিনিই তো গাইছেন আজ !

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। অসুখ সেরে গেলে আপনার সঙ্গে আলাপ হবে নিশ্চয়ই।

—আলাপ করবেন তো ? না ঘেন্না করবেন পাষণ্ড বলে ?

—আপনাকে কোলে টেনে নেবেন। কিন্তু তাকে পুরোপুরি পেতে চাইলে ঘেন্নাই পেতে হবে।

রূপমঞ্জরীর গলাটা কেমন অন্যরকম মনে হয়। একটু যেন ভারী।

আনন্দলাল চুপ করে থাকে।

মঞ্জরীও আর কথা বলে না।

শশিনাথ এসেছে। সাড়া পায় ওর গলার।

অধিবাস কীর্তন শেষ হয়ে গেছে।

সরমা এসেছে।

শশিনাথ ঘরে আসে।

আনন্দলাল চোখ বুজে আছে।

শশিনাথ বলে,—আমি খেয়ে আসছি। তুই তারপর খেতে যাবি।

মঞ্জরী ঘাড় নাড়ে।

শশিনাথ হাতমুখ ধুয়ে একটু জিরোয়। সারাদিনের খাটুনিতেও যেন ওর আনন্দ কমে নি।

বলে রান্নাঘরে সরমার উদ্দেশ্যে,—সাধু ভাই আজ মেতে গেল। এমন রূপ দেখেছ কখনও ?

সরমা সায় দেয়,—সত্যি, যখন ধরলে হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ। জায়গাটা যেন কাঁপছিল, আমার পাশের বুড়ীটা থরথর কাঁপতে কাঁপতে

পড়ে গেল। সাধু ভাইয়ের মুখখানা—মুখখানা কেন সব শরীর রাঙা টকটকে মনে হচ্ছিল। রোমাঞ্চ দেখেছ?

শশিনাথ বলে,—দেখব না কেন? সামনেই ছিলুম। একবারে কদম ফুলের মতো গায়ের রেঁায়া যেন খাড়া হয়ে উঠল। অথচ দেখেছ বেশি নাচানাচি কিন্তু করেন নি। পাঁচ গাঁয়ের কর্তারা সব থ বনে গেছে। সবাই ধন্য ধন্য করছে। গোসাইয়ের কৃপা না হলে কি আর এমনটা হয়?

সরমা সায় দেয়, বলে,—বলেছিলুম দেখো, কত বড় বড় বাড়িতে সাধু ভাইকে নিয়ে যাবে। ও কি কম মানুষ।

শশিনাথ নীলকেশরের কথায় মেতে গেছে আজ।

কথাগুলো পুষ্পবাণের মতো গিয়ে বিঁধছে রূপমঞ্জরীর বুকে। ওরা তো জানে না। ওরা জানে না যে রূপমঞ্জরী নিজেকে আর সামলাতে পারছে না। এক-একটি কথা যেন এক-একটি অঙ্গ বিবশ করছে ওর।

হাতের পাখা থেমে গেছে।

সংযত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করে রূপমঞ্জরী।

শশিনাথ খেয়ে আসে। ও আজকাল আনন্দলালের ঘরেই শোয়। যতদিন না অসুখ কমে ততদিন শুতে হবে।

মঞ্জরী ওঠে। খেতে যায়। সরমাও খেতে যায়। মঞ্জরী কথা বলে না। নীরবে খেতে থাকে।

সরমা আনন্দে উজ্জ্বল,—বলে,—বরাতটা তোমার ভালো নয় ঠাকুরঝি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় মঞ্জরী।

—এমন কীর্তন শুনতে পেলে না।

মঞ্জরী মুখ নীচু করে খেতে থাকে।

—লোকগুলোকে সব মাতিয়ে দিলে।

মুখ তোলে মঞ্জরী।

—নাম যে এত মিঠে লাগে ভাবতে পারি নি। বুকের ভেতরটা কেমন গুরগুর করছিল। একটু একটু টলাচ্ছিল আমায়।

একমুঠো ভাত মুখে তোলে মঞ্জরী।

—আর একটু হলে জ্ঞান থাকত না। আমার পাশে একটা বুড়ী ছিল, ঢুলতে ঢুলতে পড়ে গেল।

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয় মঞ্জরীর।

—সব যেন মেতে গেল। এমন মাতন বহুকাল দেখি নি।

চুপ করে তাকিয়ে থাকে মঞ্জরী।

—কাল আবার কী হবে কে জানে! তোমার দাদা তো চোখ বুজে আহা আহা করে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! হরিবোল বলে দাঁড়িয়ে পড়ল কতবার।

মঞ্জরীর খাওয়া শেষ হয়ে আসে।

সরমা মঞ্জরীর কাছ থেকে একটা উত্তরও পায় না।

তবু সে খেয়ালই যেন নেই ওর।

এইবার নিজে চুপ করে খেতে শুরু করে।

একবার বলে,—মাস্টারের জ্বর কেমন?

—কম। এতক্ষণে কথা বলে মঞ্জরী।

গলাটা ওর ধরে গেছে।

—আহা, ভালো হয়ে উঠুক। মাস্টারও কিন্তু ভারি সুন্দর গায়!

মঞ্জরী কথা বলে না।

সরমা তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড়ে।

কুয়োতলায় গিয়ে বাসন কখানা মেজে ফেলে মঞ্জরী। একখানা থালাই অনেকবার মাজতে থাকে। কী যে ভাবে ও নিজেই বোঝে না। কী এক নেশায় যেন ও মাঝে মাঝে বাইরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

চোখ দুটো খোলা আছে। অথচ কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

এমন হয়। মঞ্জরীর এখন এই দশা।

কোনমতে বাসন কখানা মেজে শুতে যায় মঞ্জরী।

ঘরে গিয়ে কাঁথাটা পেতে নেয়।

দরজাটা বন্ধ করে। জানালা খুলে দেয়।

ঠাকুর স্মরণ করে শুয়ে পড়ে।

শুয়ে পড়ে থাকে।

চোখদুটো ওর খোলা।

চোখদুটো বুজতে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে।

গাছের পাতার শিশিরের ফোঁটার মতো মুহূর্তগুলো ঝরে পড়ে।

চোখদুটো জ্বালা করছে। একটু বা রাঙাও হয়েছে।

ওপাশ ফেরে মঞ্জরী। ভালো লাগে না।

চিত হয়ে শোয়। হাতদুটো জোর করে বুকের ওপর রাখে।

চোখদুটো বুজলে জ্বালা আরও বাড়ে।

উঠে বসে মঞ্জরী।

মনটাকে বশে আনবার চেষ্টা করে।

মনে মনে নাম স্মরণ করে।

কিন্তু কোথায় যেন টানছে মনকে। অবশ করে টানছে।

বসেই থাকে অনেকক্ষণ!

রাত বাড়ে।

গ্রামখানা নিঝুম।

বিশাল আকাশের নীচে একটি সবুজ বিন্দুর মতো গ্রামখানা পড়ে আছে মাটির ওপর।

মঞ্জরী জানালার দিকে তাকায়।

এক টুকরো চৌকো নীল আকাশ।

ফাল্গুনের বাতাস আসে। দমকা বাতাস।

কাল পূর্ণিমা।

পঞ্চদশী চাঁদের পূর্ণ হয়ে ওঠা।

মঞ্জরী দাঁড়ায়।

দরজার কাছে আসে ধীরে ধীরে।

রূপমঞ্জরী টলছে।

দরজা খুলে ফেলে।

একটু শব্দ হয়।

কেউ জাগে না।

রূপমঞ্জরী ঘর থেকে বেরোয়।

এ কী করছে রূপমঞ্জরী?

অনূঢ়া বৈষ্ণবকন্যা রূপমঞ্জরী।

নিজেকে আটকাতে পারছে না। আটকাবার সামর্থ্য নেই।

দ্রুতপায়ে নেমে পড়ে উঠোনে।

কেউ যদি দেখে ফেলে! দাদা যদি ঘরটা খোলা দেখে?

কী করবে, ও যে কিছুই ঠিক করে করতে পারছে না।

দোর খোলাই রইল।

দেখতে দেখতে কলাবাগানের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

কে আসছে যেন।

খসখস শব্দ শুকনো পাতার।

কই কেউ নয়তো?

হয়তো বা পাখি উড়ে গেল তার পায়ের সাড়া পেয়ে।

ঘরের সামনে এসে পড়েছে মঞ্জরী।

নীলকেশরের ঘর।

ঘর খোলা।

ঘরের ভেতর ঢোকে।

আধা অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকায়। কই নেই তো? কই কেউ নেই তো? কেউ নেই। ফাঁকা ঘরে জিনিসগুলো আবছা আবছা নজরে পড়ে।

নীলকেশর কোথায় গেল?

তবে কি চলে গেল?

ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে।

সামনে ছোট মাঠটুকু ঘেরা।

ওই তো। ওই মাঠেরই একপাশে শুয়ে আছে যেন কে।

কে আবার ? নীলকেশর।

খোলা আকাশের নীচেই ওরা শোয়। ঘরে শুতে চায় না। ঘরে থাকতে চায় না। বাসা বাঁধে না। বুনো পাখি।

মঞ্জরী নেমে আসে। এবারে খুব আস্তে। খুব ধীরে।

মাঠের ওপর দাঁড়ায়।

তুলসীমঞ্চ। নয়নাভিরাম সজ্জায় সেজেছে বৃন্দারানী।

ফুলের সুবাসে ভরে গেছে ছোট মাঠটুকু।

রূপমঞ্জরী তাকায়।

ধীরে ধীরে নিশ্বাস নেয়। বুক ভরে ওঠে। এ সুবাস যেন ফুরিয়ে না যায়।

নীলকেশরের পাশে এসে দাঁড়ায়।

নীলকেশর ঘুমোচ্ছে। পরম নিশ্চিন্তে। পরম আরামে।

যেন কারও কোলে ঘুমোচ্ছে বিভোর হয়ে। নির্বিঘ্ন মনে।

পা দুটি গুটিয়ে আছে পাশ ফিরে। হাতদুখানাও কাঁধে জড়ানো। ছোট ছেলের মতো।

রূপমঞ্জরী চোখ দুটো এতক্ষণে প্রাণ পেয়েছে। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

দেখতে দেখতে কত সময় কেটে যায়। তবু দেখা শেষ হয় না।

ওর চোখের ঘন পল্লব পড়ে না একবারও।

দূরে কামরাঙা গাছের মসৃণ পাতা চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়।

কাল ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

কলাগাছের ছায়ার সারি এ অভিসারের সাক্ষী।

নির্জন মাঠটুকুর ওপর একা একা শুয়ে আছে নীলকেশর।

চাঁদে-ধোয়া সবুজের ওপর একবিন্দু মধু।

রূপমঞ্জরী শুধু দেখে।

সংসারে এমন মুহূর্ত বড় একটা আসে না।

রূপমঞ্জরী নীলকেশরের কাছে যায়।

খুব কাছে।

নীলকেশরের নিশ্বাসের শব্দ কানে আসে।

একটা একটা করে শোনা যায়।

মঞ্জরী আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

আবার পিছিয়ে আসে।

নীলকেশর বোধ হয় জেগে উঠল।

পা দুটো ওর নড়ে ওঠে একটু। পা দুটো টান করে।

মঞ্জরী নড়তে পারে না। পা দুটো ওর আঠার মতো আটকে থাকে মাটিতে। বুকের ভেতর শব্দ হয়।

নীলকেশর জাগল বুঝি।

না, জাগল না।

আবার ঘুমিয়ে পড়ে নীলকেশর।

মঞ্জরী আর-একবার কাছে যায়।

জাগাবে ওকে ?

হাতটা বাড়িয়ে আবার হাতটা টেনে নেয়।

না। জাগালে সব যেন ভেঙে যাবে। সব ভেঙে যাবে।

এই ভালো।

মঞ্জরী পিছন ফেরে।

চলতে থাকে। ধীরে। অতি ধীরে।

একটু সময়ের ভেতর ফিরে আসে নিজের ঘরের কাছে।

তাকায় একবার দাদার ঘরের দিকে। ঘর বন্ধ।

নিজের ঘরে ঢোকে। দোর বন্ধ করে।

এবার সর্ব শরীর অবশ হয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে।

একটু সময়ের ভেতরই গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে মঞ্জরী।

১১

ভোরে থেকে নাম গুঞ্জন কানে আসে। খোলের মৃদু আওয়াজ। করতালের টর টক শব্দ—ঝন ঝন শব্দ নয়। খুব ধীর তালে নাম ধরেছে। নাম ধরেছে নীলকেশর।

শেষ রাত্রে স্নান সেরে জপ সেরে নিয়েছে।

গুরুবন্দনা শেষ হতে খোল-করতাল এসে গেছে। এসে গেছে গুটিচারেক ছেলে।

চন্দন-তিলক নেয়া হল।

ফুল এল এক ঝুড়ি খাঁদুদের বাড়ি থেকে।

এল একগাছি মালা আর শশিনাথ।

শশিনাথ প্রণাম করলে। টাটকা ফুলের মোটা মালা।

গুরুপ্রসাদী করে পরিয়ে দিলে নীলকেশরের গলায়।

নীলকেশর নাম ধরেছে।

তাকায় মালাটির দিকে।

শশিনাথ মালা দিয়েছে তার গলায়।

শুদ্ধমনে ওর আয়নার মতো ভেসে উঠে একখানি মুখ। টিকালো নাকের নীচে পাতলা দুটি ঠোঁট।

আমি দিলাম—স্পষ্ট শুনতে পেল মনের দিকে তাকিয়ে।

নীলকেশর হাসল মনে মনে।

বাইরে ওর ঠোঁট দুটো একটু বেঁকে উঠল মৃদু হাসিতে।

—কিন্তু এল না তো একবারও ?—মনে এল নীলকেশরের।

পরক্ষণেই মনকে সংযত করলে নীলকেশর।

পরম মধুর নামচিন্তার সময় একটি মেয়ের চিন্তা !

ব্রহ্মচারী নীলকেশর নিজের ওপরই বিরক্ত হল যেন।

এ কি আকর্ষণ !

এক মুহূর্ত চিন্তা আসবার কারণ নেই। কারণ থাকা উচিত নয়।

এ আকর্ষণী বিভব মঞ্জরী পেল কোথায়।

শ্রীরাধার পদারবিন্দ স্মরণে এল। এ কি তাঁরই বিভব। রূপমঞ্জরীর ভেতর এমন মায়াযোগ প্রকাশ !

নীলকেশর মনকে স্থির করে নামে।

তুলসীমঞ্চ ঘুরে ঘুরে নাম চলেছে। ধীর তরঙ্গ।

আরও মানুষ এল ারো।

দেখতে দেখতে বেলা হয়ে এল।

শশিনাথ ভোগরাগের আয়োজনে ব্যস্ত। সরমাও এসেছে সকালে।

শশিনাথের ছেলেটি মাঠের ওপর বসে বসে নাম শুনছে অবাক হয়ে। শুনতে শুনতে একটু একটু ঠোঁট নাড়ছে।

শশিনাথ একবার দেখতে পেয়ে ভারি খুশী। সরমাকে দেখাতে যায়। এইটুকু ছেলে কেমন নাম করছে। ও বড় হলে সাধুভাইয়ের মতো না হয় !

পুজো করতে হবে নীলকেশরকে।

আর সবাই নাম চালিয়ে যায়

নীলকেশর পুজোর জন্যে তৈরী হয়।

দিনটা যেন দেখতে দেখতে কেটে যায়। মানুষে ভরে যায় মাঠখানা। গ্রাম যেন গমগম করছে আজ। চেনা নেই, জানা নেই। নাম হবে শুনতে পেয়ে চলে আসছে। সন্ন্যাসীও .এসেছেন দুটি। কোথাকার কেউ জানে না।

জানবার দরকার নেই। জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই।

সবাই জানে নামের নিমন্ত্রণ নেই। শুনলেই চলে আসে।

অভ্যর্থনা নেই। টেনে এনেছে নাম। নাম করুন। প্রণাম করুন। গড়াগড়ি দিন ধুলোয়। তারপর ইচ্ছে হলে চলে যান। কাল আসবেন। প্রসাদ পাবেন, মহোৎসব কাল। মালসা ভোগ।

মালসা ভোগের প্রসাদ নিতে আসবেন নিশ্চয়। নিমন্ত্রণ না করলেও আসবেন।

তারপর অন্ন গ্রহণ করবেন।

ভাত ডাল তরকারি। অঢেল হবে। অঢেল খাবে।

মাপজোক নেই।

হিসেব নেই। এখন তো কারো মন হিসেবী নেই। হিসেব আসবে কোথা থেকে!

মালপো হবে কম পক্ষে ছ-সাত শো। আর বোঁদে। বড় বড় শক্ত শক্ত। কয়েক ঝুড়ি।

অন্য সময় হলে এ বোঁদে মুখে দিতে পারতেন না। কিন্তু কাল খাবেন দু মুঠো নিশ্চয়ই। প্রসাদ যে! প্রসাদ উচ্চারণ করতে করতে ভাবতে ভাবতে সুস্বাদ হয়ে উঠবে।

মনে মনে ভাববেন, কী আশ্চর্য মহিমা!

আসুন। নাম ডাকছে। মানুষ নয়।

সন্ধ্যায় লোকারণ্য হয়ে যায়। বিহ্বল হয়ে নাম করছে নীলকেশর। ভররাত নাম চলবে। অষ্টপ্রহর অখণ্ড নামসংকীর্তন। শেষ হবে কাল ভোরে।

উলুপুর হরিসভার দল এসেছে।

এবার নাম ধরেছে ওরা। মূল গায়েন একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে।

হাত দুটি উঁচু করে নাম ধরেছে চোখ দুটো বুজে।

ইমন্ রাগে নাম ধরেছে! ঢিমে তালে। সুর টেনে টেনে।

স্তব্ধ হয়ে যায় সবাই।

মনগুলো সব গলে এক হয়ে যায় যেন।

এক নামে একমন হয়ে আসে।

মনের ভেতর থেকে বুদ্‌বুদের মতো একটি কথা ভেসে ওঠে—আহা! আহারে!

নীলকেশর পুজোর জন্যে তৈরী হয় আবার।

টানা টানা আধবোঁজা চোখদুটোয় ওর দৃষ্টি নেই।

চোখ দুটো যেন ঢেকে গেছে কোনো অথৈ আনন্দের গভীরে।

রাত বাড়ে।

মানুষ কিছু কিছু কমে আসে।

নীলকেশর পুজোয় তন্ময় হয়ে আছে।

কেবলি মনে হয় ওর—নয়নং গলদশ্রুধারয়া

বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপু কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

তোমার নাম করলে কবে আমার নয়ন দুটি অশ্রুধারায় ভরে যাবে? গদ্‌গদ-স্বরে রুদ্ধ হয়ে উঠবে আমার কথা, আমার ভাষা? কবে আমার দেহ মধুর পুলকের আস্বাদ পাবে? কবে? আর কবে? এ জন্মের স্বপ্ন কি সফল হবে না? বৃথাই যাবে জীবনের মুহূর্তগুলো?

ওগো নন্দাত্মজ কৃষ্ণ, আমাকে তোমার পাদপদ্মরাগের মতো ভাবতে কেন পারবে না।

কৃপয়া তব—পাদপঙ্কজস্থিত
ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

কেন তুমি আমাকে তোমার নিজের করে নেবে না?

তোমাকে না দেখে চোখদুটোয় আমার বর্ষা নেমেছে।

অবিরল ধারায় বর্ষা নেমেছে।

এত বর্ষণেও কি মনের মেঘ কাটবে না?

তোমাকে না দেখে যে সংসারে কিছুই নেই বলে মনে হচ্ছে।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥

তবু কি তুমি আসবে না?

আমি যে সবকিছু ত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি।

পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবা

নতি বিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতি বিদস্তবোদ্গীত—মোহিতাঃ

কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

ওগো স্বামীপুত্র ভাই বন্ধু সব ছেড়ে তোমার স্বর শুনে এসেছি।

তুমি জান আমি কেন এসেছি।

ওগো কপট, গভীর রাত্রে স্বয়ং সমাগত সুন্দরী তরুণীকে কে পরিত্যাগ করে?

নীলকেশরের গাল দুটো ভেসে যায় চোখের জলে।

সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে ওঠে বারে বারে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়।

আরও মানুষ কমে আসে।

নীলকেশরের সামনে প্রণাম করে চলে যায়।

নীলকেশর স্থির হয়ে বসে আছে।

রূপমঞ্জরী এসেছে।

এসে দাঁড়িয়ে আছে সকলের অলক্ষ্যে ঘরের দোরের চৌকাঠের ওপর।

দোরের কাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সর্বাঙ্গ বিবশ যেন। মন এত ভার। বইতে পারছে না যেন।

উলুপুরের হরিসভার নাম চলেছে তখন দ্রুত লয়ে।

ধীর স্থির হয়ে এসেছে কীর্তনবাসর।

নাম চলেছে দ্রুত লয়ে কিন্তু আস্তে, ইমন্ সুরে।

করতালের শব্দ ঠুক ঠুক ঠন ঠুক!

সবটুকু স্থানই আবেশে ভরে উঠেছে।

বাতাসে আবেগের দোলা। রসাবেশ।

নীলকেশর ধীরে ধীরে ওঠে, দুলতে দুলতে।

ঘরের দিকে এগোয়।

রূপমঞ্জরী কেঁপে ওঠে।

ঘরের ভেতর দোরের এক পাশে সরে দাঁড়ায়।

নীলকেশর ভেতরে চলে আসে। ঘরের ভেতরে, একটু স্থির হয়ে বসতে হবে, শান্ত হয়ে।

ভাবপ্রাবল্যে ও বাইরে স্থির থাকতে পারছে না আর।

রূপমঞ্জরী সামনে এসে দাঁড়ায়।

আঁচল থেকে এক ছড়া মালা বার করে হঠাৎ পরিয়ে দেয় নীলকেশরের গলায়।

নীলকেশর চমকে উঠে তাকায়।

রূপমঞ্জরীও আবেশে ভরে উঠেছে। টলমল করছে।

হঠাৎ ওর হাত দুটো চেপে ধরে রূপমঞ্জরী।

ঘরের আধনেভা তেলের প্রদীপটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

হাত দুটো চেপে ধরে তাকায় বড় বড় চোখ মেলে।

শরীরটা ওর থরথর করে কাঁপে।

প্রতি স্নায়ুতে কাঁপুনি লাগে রূপমঞ্জরীর।

ও বিবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে।

কিসের একটা যন্ত্রণা অনুভব করে নীলকেশর।

ভাবভঙ্গ হয় বুঝি!

হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে উঃ! শব্দ করে ওঠে।

রূপমঞ্জরী ওর পায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে।

—তুমি কেন এলে? —বলে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায় নীলকেশর। যাবার আগে মালাটা খুলে রেখে যায়।

রূপমঞ্জরী পড়ে থাকে ঘরের মেজেতে অনেকক্ষণ।

মালাটা পড়ে আছে ওঁর সামনে। খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে।

বাইরে নাম চলেছে তখন আরও দ্রুত লয়ে।

ওদের নাম শেষ হয়ে এল প্রায়।

খুব ধীরে ধীরে এবার নাম ধরেছে নীলকেশর।

ভররাত চলবে আজ নামকীর্তন।

ভাবঘন আনন্দ ওর অকস্মাৎ ভেঙে পড়েছে রূপমঞ্জরীর স্পর্শে। যেন অনেক গভীর জলে আনন্দে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ ডাঙায় উঠে পড়েছে একটা মাছ।

ছটফট করছে নীলকেশর।

ভেতরে একটা জ্বালা অনুভব করছে।

আবার নাম করতে হবে। প্রাণ ভরে নাম করতে করতে ভাবঘন হয়ে আসে যদি, তবেই এ জ্বালা কমবে। তন্ময় হয়ে নাম করছে নীলকেশর।

রূপমঞ্জরী ফিরে যায়। ফিরে আসে ঘরে। মালাটি নিয়ে আসে নি। তেমনি পড়ে আছে। নীলকেশর ঘরে এসে দেখবে। দেখুক।

রূপমঞ্জরী চলে এসেছে ওর ঘরে। ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকে রূপমঞ্জরী। শরীরটা জ্বলতে থাকে। স্থির হয়ে বসতে পারে না। নীলকেশরের স্পর্শ তখনও হাত দুটোয় অনুভব করছে। নীলকেশরের মনের ছোঁয়া লেগেছে যেন ওর হাত দুটোয়। হাতদুটো বারে বারে দেখে। হাত দুটো জ্বলছে কেন? নীলকেশর কি ঘৃণা করল।

স্পর্শ ঘৃণার জ্বালা!

রূপমঞ্জরীর কানদুটো দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে।

শাড়ির নীচে বুকটা যেন আতপ্ত অঙ্গারের মতো জ্বলছে!

একি কোন ক্ষুধা?

মঞ্জরী ক্ষুধা নিয়ে গিয়েছিল নীলকেশরের কাছে? তবে নীলকেশর অন্যায় করে নি একটুও।

ও যে ব্রহ্মচারী।

কামজ দেহ যে ওর কাছে বিষ!

মঞ্জরী মনের নীচের তলায় তাকায়।

পরিষ্কার দেখতে পায় আজ ভেতরে সুপ্ত লালসার জ্বালা।

ও আজ প্রথম দেখল। শেষ পর্যন্ত দেখল।

মনের তলায় সকরুণ আর্তনাদ শুনতে পায়।

নীলকেশরকে ওর চাই। সম্পূর্ণ চাই। দেহ মন সব চাই।

শুনতে পায় মঞ্জরী। নিজের ওপর নিজেরই ঘৃণা হয়। ওর মনের এই করুণ রূপ ও দেখতে চায় নি। তবু দেখতে হয়। জ্বলতে হয়।

কেমন করে এ আর্তনাদ রোধ করবে মঞ্জরী ?

ও যে দেখতে পেয়েছে ও কত অসহায়।

ও নিজেকে দেখতে পেয়েছে এক দীপ্ত ব্রহ্মচারীর তপস্যা ভঙ্গের উগ্রকামনার মতো। উর্বশীর মতো অপরূপ মোহিনী রূপ!

এই কি ওর স্বরূপ!

তবে ও কোন মুখে আর যাবে নীলকেশরের কাছে ?

যেতেই হবে। আবার যেতে হবে। জয় করতে হবে ওর ব্রহ্মচর্যের দম্ভকে।

নীলকেশরকে নিঃশেষ করে নিতে হবে।

গ্রাস করতে হবে।

কেঁপে ওঠে রূপমঞ্জরী।

এমন ভয়াবহ মোহজ রূপ তার ভেতরে যেন যুগাযুগান্ত ধরে রয়ে গেছে।

এই বুঝি তার স্বরূপ!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় রূপমঞ্জরী।

কৃষ্ণগতা রূপমঞ্জরীর এমন রূপ হল কোথা থেকে ?

নীলকেশরের পরীক্ষা চাই।

এক ভয়হীনা পরমা রূপসী নীলকেশরকে যেন আহ্বান করছে এক যুদ্ধে।

নীলকেশরের ভীত ম্লান মুখখানা অনুমান করে রূপসার হাসি পায়।

রূপসী ফণা ধরেছে মঞ্জরীর অন্তরে।

মঞ্জরী এই চিরকালের নির্দয় রূপসীকে আবিষ্কার করেছে আজ ওর মনের ভেতর।

এক তৃপ্তির আস্বাদ পাচ্ছে যেন।

নীলকেশরকে পরাজিত করে অসহায় দুর্বল পশুর মতো পায়ের তলায় এনে ফেলেছে—এ যেন ও পরিষ্কার দেখতে পায়।

বন্দী পুরুষের করুণ আর্তনাদে এক রমণীয় উল্লাস অনুভব করছে ও।

রূপমঞ্জরী চোখ বোজে।

ভাবে, যা অনুভব করছি,—এ কি সত্য ?

নীলকেশরকে আত্মময় করবার কুটিল সুখানুভব। এ কি সত্য ?

রূপমঞ্জরী আজকে নীলকেশরের প্রত্যাখ্যানের জবাব পেয়েছে।

এ উল্লাস ওকে অন্ধ করে দেয়।

নাম কানে আসে।

উচ্চৈঃস্বরে নাম হচ্ছে।

মঞ্জরী ওঠে

একবার আনন্দলালের ঘরে যেতে হবে। ওকে ওষুধ খাওয়াতে। বসে হাওয়া করতে হবে ওকে যতক্ষণ না দাদা ফিরে আসে।

শশিনাথ গেছে কালকের মহোৎসবের তরকারির যোগাড়ে।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রূপমঞ্জরী।

বাইরের ঘরের দিকে আসে।

রান্নাঘরের পাশে পেঁপে গাছটার তলায় ঝকঝক করে—এক বিড়ালীর একজোড়া চোখ।

মঞ্জরী আনন্দলালের ঘরে আসে।

ঘরে ঢুকে দেখে আনন্দলাল বালিশে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে আছে। বোধ হয় একমনে শুনছিল দূর থেকে ভেসে আসা নাম।

জ্বর আর আজ হয় নি। আশ্চর্য তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠছে আনন্দলাল।

মঞ্জরীকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু হাসে ও।

মঞ্জরী কাছে বসে একটু হাসে,—ওষুধটা খেয়েছেন ?

—কোন ওষুধ ?

—বারে বা, ওই তো মাথার কাছে রয়েছে।

আনন্দলাল একটু অপ্রস্তুত হয়,—এখন খেতে হবে মনে ছিল না।

ওষুধটা গেলাসে ঢেলে জল মিশিয়ে বলে মঞ্জরী,—নিন, খেয়ে নিন।

আনন্দলাল ওষুধ খেয়ে নেয়।

—নিন, এবার শুয়ে পড়ুন।

—এই রকম একটু থাকি। সংকীর্তনের আওয়াজ বড় ভালো লাগছে।

মঞ্জরী হাসে,—আপনারও সংকীর্তন ভালো লাগে।

—কেন ?

—না, এমনি। আপনি নিজে তো কি চমৎকার গাইতে পারেন।

ইচ্ছে করে একটু বেশী কথা বলছে মঞ্জরী, বেশী হাসছে।

—গান আর কীর্তন অনেক তফাত যে!

—কি আর তফাত!

—এবার ভালো হলে কীর্তন শিখব।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, প্রথমেই শিখব তোমার নামকীর্তন, তুমি যেটি ঠাকুরঘরে রোজ গাও।

—শিখবেন, মাইনে দেবেন তো ?

—মানে ?

—নিজে তো গান শেখালে মাইনে নেন। দাদার কাছ থেকেও তো নেন।

—তা নিই। কিন্তু তোমার দাদার কাছে কখনও চাই নি। ও ইচ্ছে করে যা দেয়!

মঞ্জরী অকারণেই হাসে,—আচ্ছা, টাকাগুলো কি করেন ?

আনন্দলাল ওর প্রশ্নে একটু অবাক হয়। কেমন যেন একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে আজ মঞ্জরীকে।

—টাকাগুলো খরচই করি।

—কি এত আপনার খরচ শুনি ?

—অনেক। খাওয়া, থাকা, নেশা।

—নেশা ?—মঞ্জরী চমকে ওঠে।

আনন্দলাল হাসে,—মানে সিগারেট-টিগারেট তো খেতে হয়।

—ওগুলো না খেলেই হয়।

—তা হয়। অত ভাবি নি।—একটু অবাক হচ্ছে আনন্দলাল।

—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায়?

আনন্দলাল হাসে। ওর চিরকালের উত্তর,—ঠিক মনে নেই।..

—সে আবার কি! দেশ আবার কেউ ভুলে যায় নাকি?

—ছোটবেলার কথা কি অত মনে থাকে?

—বড় হয়ে বুঝি কখনও দেশে যান নি?

—না।

—বরাবর কলকাতায় থাকেন?

—তাও কি বলা যায়। এই যেমন এখন এখানে আছি।

—এ তো মোটে দিনকতক।

আনন্দলাল চোখ দুটো বোজে, –চিরকাল থাকতেও তো পারি।

মঞ্জরী চুপ করে থাকে।

—কি, তাড়িয়ে দেবে?

—কি যে বলেন, অতিথিকে কেউ তাড়ায়? অমন কথা বলতেও নেই কাউকে।

রূপমঞ্জরীর গলাটা নরম মিষ্টি হয়ে ওঠে।

—কেন বল তো?

আরও মধুর গলা মঞ্জরীর,—গোঁসাইয়ের বারণ।

মঞ্জরীর আসল চেহারাটা এতক্ষণে নজরে পড়ে আনন্দলালের।

আনন্দলাল বলে,—তোমাদের গোঁসাই থাকেন কোথা?

—শ্রীবৃন্দাবনে। রাধাকুণ্ডের কাছে। বাবা যেতেন বছরে একবার।

—তোমরা যাও নি?

—না।

—তবে কি করে জানলে গোসাই কি বলে?

—বাবা বলতেন, আমরা শুনতুম।

—বাবা ঠিক বলতেন কি করে বুঝলে?

—কি যে বলেন। বাবা জীবনে মিছে কথা বলতেন না।

এর পর আর কিছু বলা যায় না। আনন্দলাল তাকায় মঞ্জরীর মুখের দিকে। কি ঠাণ্ডা নরম মুখখানি মঞ্জরীর! চোখজোড়া গভীর কালো, শীতল—অতল।

মঞ্জরীও তাকিয়ে থাকে। চোখ নামায় না আজ!

বলে,—যে সাধু এসেছেন, গোঁসাইয়ের কথা তাকে জিজ্ঞেস করবেন।

—তাঁর সঙ্গে তো আলাপ হল না! তিনিই তো শুনলুম গাইছেন।

মঞ্জরীর মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে,—আমিই আলাপ করিয়ে দেব। আপনার অসুখ সারুক।

—তাই ভালো।

বলে এবার শুয়ে পড়ে আনন্দলাল।

মঞ্জরী বাতাস করে কিছুক্ষণ।

শশিনাথ ফিরেছে।

গলার আওয়াজ পায় মঞ্জরী।

সরমা আনন্দলালের দুধ-বার্লি দিয়ে যায় ঘরে।

বলে,—তোমার দাদা খেতে বসেছে। আসছে।

বার্লি-দুধটা মিশিয়ে দেয় মঞ্জরী।

বলে,—খেয়ে নিন।

—আবার খাওয়া! একটু বিরক্ত হয় আনন্দলাল।

—কেন, ভাত খেতে ইচ্ছে হয় বুঝি? বার্লি ভালো লাগে না?

—ভাত? কবে দেবে ডাক্তার?

—আর দিনদুয়েকের ভেতর।

—মনে হচ্ছে যেন কতকাল ভাত খাই নি।

হেসে ফেলে মঞ্জরী,—ভাত দিলে কিন্তু বেশী খেতে পারবেন না। ও চোখের খিদে!

—আর-একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—কি?

—তোমার হাতের এক গেলাস ঠাণ্ডা জল।

মঞ্জরী একটুও গম্ভীর হয় না এ কথা শুনে। হাসে। বলে,—আমাকে দেখলেই বুঝি জল খাবার কথা মনে হয়?

—সত্যি তাই।

—কেন? জল ছাড়া আর কিছু দিতে পারি না আমি?

—কী দিতে পার শুনি?

মঞ্জরী হাসতে হাসতে বলে,—দেখবেন ভাত রেঁধে দেব। আলু ভাজা করে দেব। খুব কুচো কুচো আলু ভাজা খেয়েছেন কখনও?

—কি রকম?

—জিরের মতো কুচো কুচো?

—না। খাই নি।

—খুব সরু চালের ভাত। সোনা মুগের ডাল সেদ্ধ। কুচো কুচো আলু ভাজা আর গাওয়া ঘি খানিকটা।

আনন্দলাল হেসে ফেলে,—থাক আর বোলো না। শেষকালে কালই চেয়ে বসব।

—কাল চাইলে আপনাকে দিচ্ছে কে?

আনন্দলাল দুধবার্লির বাটিতে চুমুক দেয়।

মঞ্জরী বাটিটা রেখে বাইরে যায়।

রান্নাঘর থেকে এক গেলাস জল নিয়ে ফেরে।

—এই নিন জল। আমাকে দেখলেই জল জল!

—রাগ করছ?—বলে আনন্দলাল জলটুকু খেয়ে নেয়।

—আঃ! কি ঠাণ্ডা! আর কি মিষ্টি! এখানকার কুয়োর জলই বোধহয় মিষ্টি!

—জল মিষ্টি না, কি মিষ্টি কে জানে!

বলে ওঠে মঞ্জরী। আবার বলে,—দাদা আসছে, আমি যাই।

চলে যায় মঞ্জরী।

আনন্দলাল তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

মনে মনে ওর হাসি পায়,—আপনার বলে ভাবতে পারলে এরা কত শীঘ্র আপনার করে নিতে পারে। লেখাপড়া জানে না, আধুনিক সভ্যতার ধার ধারে না। প্রাণের পরিচয়ই এদের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

প্রাণ ঢেলে দিতে জানে। কিন্তু সহজে নয়।

জীবনকে পূর্ণ করে তুলবে প্রাণের স্পর্শে—উত্তেজিত স্নায়ুর স্পর্শে নয়।

আনন্দলালের ভালো লেগেছে। এত ভালো জীবনে বোধ হয় আর কিছুই লাগে নি! এ ভালোবাসার আনন্দ ও সহজে হয়তো বা ছাড়তে পারবে না।

১২

দিন কয়েকের ভেতরেই আনন্দলাল সুস্থ হয়ে ওঠে। শেষের কয়েকদিন মঞ্জরী প্রায় সব সময়ই ওর পাশে থাকত। ভাত খেয়ে বেশ ভালো হয়ে উঠল ও। শরীরটা একটু দুর্বল রয়েছে আর মাথাটা ঝিম ঝিম করে মাঝে মাঝে। জ্বরটা 'ম্যালিগন্যাণ্ট' হতে পারত। হলে সত্যিই আর বাঁচত না আনন্দলাল। এখানে আসবার দু-তিন দিনের ভেতরই মাথার যন্ত্রণাটা কমে গেল। বেঁচে গেল ও। কে বাঁচাল কে জানে।

আনন্দলাল জানে ওকে বাঁচাল মঞ্জরী।

নামকীর্তনের সেই রাতের পর থেকে একদিনও নীলকেশরের ঘরে আর যায় নি মঞ্জরী। ইচ্ছে করেই যায় নি।

ভোরে নগরভ্রমণে বেরিয়েছে ওরা। মাতামাতি হয়েছে ধুলোটে।

আবেশে রাস্তায় গড়িয়ে কেঁদেছে অনেকে। নীলকেশরকে অনেকে দেবতা জ্ঞান করছে।

মঞ্জরী শুনেছে সব।

নগরপরিক্রমার সময় নামরব কানে এসেছে।

মনে মনে পরিষ্কার ছবি দেখতে পেয়েছে, নীলকেশর পথে নেমেছে। গাইছে চোখদুটো বুজে। চোখের জলে হয়তো গাল দুটো ভেসে যাবে

রোদের তাপে বুকখানা টুকটুকে লাল হয়ে উঠবে। অগোছালো বড় বড় চুল গড়িয়ে পড়বে চোখে মুখে। ওর পায়ের ধুলো নেবে সবাই।

মঞ্জরী নেবে না।

পায়ের ধুলোর ভিখিরী নয় মঞ্জরী।

সরমা ডেকেছে,—দেখবে এস ঠাকুরঝি। আমাদের দোরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জরী ডাল সম্বরা দিতে দিতে বলছে,—তুমি যাও। আমি ডালটা নামিয়ে ডালনা তুলে দিই। রোগা মানুষ খাবে।

সরমা অবাক হয়েছে—আনন্দলালের জন্যে এত দরদ!

চলে গেছে সরমা।

মঞ্জরী ডাল সম্বরা দিতে গিয়ে খানিকটা ডাল ফেলে দিয়েছে উনুনে। উনুনের ডাল-পোড়া ধোঁয়ায় চোখে জ্বালা ধরেছে।

ভিজে উঠেছে ওর বড় বড় চোখ দুটো—নিশ্চয়ই ধোঁয়ায়।

হাতের উলটো পিঠে চোখ দুটো মুছে তরকারি সাঁতলাতে শুরু করেছে।

ভিজে চোখ দুটো আবার মুছতে হয়।

এখন তো ধোঁয়া নেই?

কি যে হল পোড়া চোখ দুটোর?

সরমা ছুটে আসে আবার,—ওরে বাবা! মানুষ গিজগিজ করছে। কত গাঁ থেকে যে লোক এসেছে!

—তাই নাকি?—কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছে মঞ্জরী।

—মচ্ছবে যাবে না! তোমার দাদা যা বললে এলাহি ব্যাপার! মাটিতে বড় বড় গর্ত করে তার ওপর বড় বড় কলাপাতা বিছিয়ে গর্তের ভেতর ভাত ঢেলেছে। কত লোক যে খাবে ঠিক নেই!

মঞ্জরী চুপ করে শোনে।

বুকের ভেতরে ওর বাষ্প জমে। ভাব-বাষ্প। এ বাষ্প আর গলে না।

আতপ্ত বুকে এক নিদারুণ চাপ অনুভব করে মঞ্জরী।

আবার সেই জ্বালা! কাল সন্ধ্যার মতো জ্বালা!

মঞ্জরী জিজ্ঞেস করে খুব সহজ স্বরে,—তুমি কখন যাবে?

—ওরা ধুলোট থেকে ঘুরে এলে। বিকেলে।

—অতক্ষণ থাকতে পারব না আমি না খেয়ে!

—সেকি গো! বোষ্টমের ঘরের মেয়ে! এ কি কথা!

মঞ্জরী হাসবার চেষ্টা করে,—তা হোক, তুমি আমার জন্যে একটু মালসা ভোগ নিয়ে এস।

সত্যিই মঞ্জরী যায় না।

শোনে পঞ্চতত্ত্বের মালসা ভোগ হয়েছিলো।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।

শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি ভক্তবৃন্দ॥

এরাই পঞ্চতত্ত্ব।

জানে রূপমঞ্জরী।

সব জেনেও যায় নি।

ও যাবে আজ। আনন্দলালকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ঠাকুরঘরে গিয়ে সেদিন সমস্ত দিন বসে থাকে। একসময় শুয়েও পড়ে। মনে মনে বলে বার বার, অপরাধ নিও না গোঁসাই। পায়ে ধরি অপরাধ নিও না। আজ কিছুতেই যেতে পারব না আমি। কিছুতেই না।

ভরদিন ঠাকুরকে স্মরণ করে।

সরমা মালসা ভোগ নিয়ে আসে। চিড়ে দই-মাখা।

সরমার আসতে আসতে সন্ধ্যা উতরে যায়।

মঞ্জরী তখন বাইরের ঘরে। আনন্দলালের কাছে।

সরমা গিয়ে মালসা ভোগ দেয়।

মাথায় ছুঁইয়ে প্রসাদ পায় মঞ্জরী।

আনন্দলালকে দেয়,—মালসা ভোগ।

আনন্দলাল প্রসাদ নেয়। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম।

কখনও মনে পড়ে না আনন্দলালের, ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেছে এত সহজ ভাবে।

তবু একটু হেসে বলে,—মালপো কই ?

—বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে।

—তুমি গেলে না ?

—না। সবাই গেলে বাড়ির অতিথিকে দেখবে কে ?

আনন্দলাল বলে,—আমার জন্যে আটকে রইলে ?

মঞ্জরী জবাব দেয় না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

আনন্দলাল কথা বাড়ায় নি আর।

কদিন কেটে গেছে তারপর। আজ মঞ্জরী যাবে। বেলা না পড়তে চুল বাঁধে। নাকে রসকলিটি আঁকে সযত্নে। মুখখানা ভালো করে মুছে নেয় বার বার। ছোট আয়না দিয়ে দেখে নিজের মুখ।

সবুজ ডুরে তাঁতের শাড়িখানা পড়ে আঁটসাঁট করে। কপালে চন্দন-কুঙ্কুমের টিপ। একটু বড়। পা দুখানা ঘসে পরিষ্কার করে আলতা পরে পায়ে। জল-আলতায় রাঙা হয়ে ওঠে হাতের তালু দুটি।

বেলা পড়ে আসে। ও ধীরে ধীরে আনন্দলালের ঘরে যায়। বাইরের ঘরে। আনন্দলাল তানপুরাটা নিয়ে ং টাং শব্দ করছিল বসে বসে।

মঞ্জরীর দিকে তাকায়।

অপরূপ।

সুস্থ শান্ত যৌবনের কি অপরূপ দীপ্তি !

সজ্জায় কিছুমাত্র বাহুল্য নেই। ঝলমলিয়ে উঠছে না মাজাঘসা নকল চুমকির মত। তবু চোখ নামতে চায় না। ফিকে সবুজ ডুরে শাড়িতে জড়ানো নরম দেহের দুপাশে দুটি হাত। শুধু হাত। শুধু হাতের যে এমন রূপ, না দেখলে জানা যেত না। গোলা খয়েরের মতো নরম রঙের হাত দুখানি। শুধু—শুধু। মুখখানি 'সিলভারের' নয়। কাঁচা সোনায় যেন কিছু তামার খাদ ! সদ্য আঁকা চন্দনের রসকলি। পরিষ্কার কপালটির

ওপরে টিপ একটি। নিখুঁত করে আঁচড়ানো সিঁথি, ফাঁপানো ফোলানো চুল নয়। আঁট করে আঁচড়ানো।

কিছুক্ষণ চোখ নামাতে পারে না আনন্দলাল।

মধুময়ী অভিসারিকা যেন।

পদাবলী কীর্তন জানত কিছু আনন্দলাল।

তানপুরো হাতেই ছিল। ও গুনগুন করে গেয়ে ওঠে—

রতি সুখসারে গতমভিসারে,
মদন মনোহর বেশম।
ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বম,
মনুসর তং হৃদয়েশম্॥

তিমিরাভিসারের পদ, জয়দেবের।

ধীর সমীরে যমুনাতীরে,
বসতি বনে বনমালী।
গোপী পীন পয়োধর মর্দন-
চঞ্চল করযুগশালী॥

আর বিলম্ব নয়। রতিলালসায় কৃষ্ণ অপেক্ষা করছে। যমুনাতীরে কুঞ্জবনে গোপীদের সুউচ্চ কুচমর্দন অভিলাষী চঞ্চল বাহু দুটি নিযে বনমালী বসে রয়েছেন অধীর প্রতীক্ষায়। অভিসার সার্থক কর। চল। আর বিলম্ব নয়।

আনন্দলাল অন্তরে মধুর আনন্দের আস্বাদ পায় বুঝি।

অকস্মাৎ পদাবলী ওর মুখে শুনে একটু বিস্মিত হয় রূপমঞ্জরী।

একটু বা লজ্জা।

ও চোখ দুটো নামিয়েই বলে,—থাক, আর গান নয়, চলুন। মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করবেন।

আনন্দলালের দৃষ্টির মানেটা বোঝা শক্ত নয়।

ওর গালের দুপাশ কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে।

আনন্দলাল গান থামায়, হাসে,—পদাবলী জানি। যার তার নয়। জয়দেবের।

মঞ্জরী একটু সহজ হয়ে বলে,—এ গান শুনেছিলাম। মদনগোপাল গেয়েছিলেন এখানে বছর কয়েক আগে। তার চেয়েও কিন্তু আপনার গলায় ভালো লাগল।

আনন্দলাল হেসে ফেলে। তাহলে কীর্তনীয়ার চেয়েও ভালো গাইতে পারি ?

—নিন। এখন উঠুন তো !

আনন্দলাল ওঠে। পাঞ্জাবিটা পরে নেয়। চটিটা পায়ে গলিয়ে নেয়।

—জুতো নিয়ে ঘরে ঢুকবেন না যেন।

—না, অত পাষণ্ড ভেব না—বলে আনন্দলাল।

ওরা চলে আসে গোঁসাইয়ের কুটিরের সামনে। ভাঙা কুঁড়ে। কোনমতে জোড়া-তালি দেয়া। আনন্দলাল একটু অবাক হয়।

একটু হেসে জিজ্ঞেস করে,—এর ভেতর মানুষ থাকে ?

মঞ্জরীও হাসে,—মানুষ নয়। সাধু থাকে।

মঞ্জরী ঘরের ভেতরে ঢোকে।

—কই গো মহারাজ।

নীলকেশর আধশোয়ার মতো হয়ে পড়েছিল একখানা চাটাইয়ের ওপর। একটা হাত ছিল মাথায়।

উঠে বসে।

তাকায় চোখ মেলে। বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকায়। চোখদুটো যেন মঞ্জরীর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নেয়।

—এস।

মঞ্জরীর সর্বাঙ্গে এক অপরূপ দীপ্তি আজ। নিরাভরণ সাজ। তবু সযত্ন কোমল হাতের স্পর্শ সর্ব শরীরে।

নীলকেশর চোখ ফেরাতে পারে না এমন তো হতে পারে না ?

চোখ ফেরায় নীলকেশর।

পেছনে ঢোকে আনন্দলাল।

—নমস্কার সাধু ভাই।

দুহাত জোড় করে নমস্কার করে আনন্দলাল।

প্রতিনমস্কার করে নীলকেশর।

একটু মধুর হেসে বলে—আসুন। বসুন।

চাটাইয়ের ওপরই বসে পড়ে আনন্দলাল।

মঞ্জরী মাটির ওপর পা মুড়ে বসে।

—আপনার নাম শুনে যা আন্দাজ করেছিলাম। তার চেয়েও ভালো লাগছে আপনাকে দেখে।

আলাপচারী আনন্দলাল বলে। পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।

সলজ্জ হেসে চোখ নীচু করে নীলকেশর।

মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বলে, —মহোৎসবে এলে না ?

মঞ্জরী আনন্দলালের দিকে তাকিয়ে হাসে,—আসতে দিলে তো! এঁর যা অসুখ। ইনি দাদার মাস্টারমশাই। কলকাতায় থাকেন। তিনকুলে কেউ নেই। অসুখ হয়ে চলে এলেন এখানে।

আনন্দলাল হাসে, বলে,—দেখুন তো সাধু ভাই। অতিথিকে সেবা করে কেমন কথা শোনাচ্ছে।

নীলকেশর হাসে। মনের কোথায় যেন ওর কি একটা ভালো-না-লাগা ভাব জমে।

মঞ্জরী খিল-খিল করে হেসে ওঠে,—বলব না কেন ? এই আর একটি। তিনকুলে কেউ থেকেও নেই। এখানে এসে ডেরা বেঁধেছে।

নীলকেশর হাসে না। শান্ত চোখে তাকায় একবার।

মঞ্জরী আর হাসতে পারে না। কথা পালটায়,—উনি কিন্তু খুব ভালো গাইতে জানেন ?

নীলকেশর কথা বলে,—তাই নাকি ?

আনন্দলাল হেসে বলে,—অথচ মজা এই যে সে গান ওনার ভালো লাগে না!

—ভালো লাগে না বলেছি কখনও ?

—না বললেও বোঝা যায়। আপনার কীর্তনের আওয়াজ পেলে কান পেতে থাকে। ডেকেও সাড়া পাই নি।

—মিছে কথা বলবেন না।—যেন ধরা পড়ে গেছে মঞ্জরী।

—মিছে কথাটা আর তুমি বোলো না, নিজে চোখে দেখা।

নীলকেশরের ভেতরের ভালো-না-লাগা ভাবটা যেন অকস্মাৎ কেটে যায়।

তবু শান্ত নীলকেশর।

ও কথাটা বাড়তে না দিয়ে বলে,—তাহলে গান শোনাচ্ছেন কবে ?

—যেদিন বলবেন। কিন্তু দক্ষিণা চাই।

নীলকেশর বলে,—কি দক্ষিণা আর দিতে পারি।

আনন্দলাল বলে,—আপনার কাছ থেকে কীর্তন শিখব। গুরু হতে হবে।

হাতজোড় করে বলে নীলকেশর,—গুরু কথাটি উচ্চারণ করবেন না। আমি যা জানি শোনাব।

—শেখাবেন না, শোনাবেন ?

—কেউ কাউকে সংসারে কিছু শেখাতে পারে না। ওটা তো অহংকারের কথা হবে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। ঠিক বলছি। সবাই নিজে নিজেই শেখে। কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে, কেউ পড়ে শেখে। কেউ নিজে নিজেই ভেবে শেখে।

আনন্দলাল এত সহজ কথাটা এমন ভাবে শুনে একটু অবাক হয়।

গম্ভীর হয়ে বলে,—নিজে নিজে ভেবে শেখে মানে ? ঠিক বুঝলুম না।

নীলকেশর শান্ত হাসে,—মানে জ্ঞান তো সবই আমাদের ভেতরেই আছে। নজরটা ঠিক-ঠিক ভেতরের দিকে ফেরাতে পারলেই সবই জানা যায়।

আনন্দলাল অবাক।

—নজর আমাদের সব সময়ই বাইরে কি না? ভেতরের খবর আর কে রাখছে বলুন?

—কথাটা বেশ নতুন লাগল তো। ভারি ভালো লাগল।

নীলকেশর বেশ সহজ হয়ে বলে,—নতুন নয়। এ অনেক পুরোনো কথা। আমরা জানি না বলে নতুন মনে হয়। যাকগে, সন্ধ্যেবেলা আসুন না কাল। গান শোনাবেন?

—আসব। নিজের ভালো লাগছে বলেই আসব।

নীলকেশর হাসে,—এলে বুঝব আপনার কৃপা।

তারপর মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বলে,—প্রসাদ পেয়েছিলে?

মঞ্জরী যেন তন্ময় হয়ে কি ভাবছিল।

নীলকেশর উঠে একটা মাটির সরা থেকে বাতাসা বার করে দেয় আনন্দলালের হাতে। মঞ্জরীর হাতে। মঞ্জরী দুহাত পেতে বাতাসা নেয়।

সলজ্জ হেসে বলে নীলকেশর,—জল কিন্তু নেই ঘরে, মানে—

মঞ্জরী তাকায়—বোঝে জল তোলা হয় নি। মঞ্জরী না এলে আর ঘাট থেকে জল দিয়ে যাবে কে।

আনন্দলাল বলে,—আপনি বুঝি জল খান না?

—মানে খাওয়া হল হল, না হল না হল। কিছু ঠিক থাকে না। আজ এক বাড়ি মাধুকরী ছিল। সেখানে প্রসাদ পেয়ে জল খেয়ে এসেছি। আর কি দরকার?

—যদি তেষ্টা পায়?

—তেষ্টা পাবে না ভাবলে আর পায় না।

আনন্দলাল হাসতে থাকে,—আপনি ভারি মজার মানুষ তো?

মঞ্জরী বাতাসা কখানা হাতে নিয়ে বসেই ছিল।

আনন্দলাল বলে,—আজ উঠি। কাল সন্ধ্যেবেলা আসব।

ওঠে আনন্দলাল, মঞ্জরীকে জিজ্ঞেস করে,—তুমি যাবে না?

মঞ্জরী বলে,—আপনি যান। আমি এঁর ঘরখানা পরিষ্কার করে, জলটা তুলে দিয়ে যাচ্ছি।

আনন্দলাল হাসে,—এখানেও সেবা ?

মঞ্জরী ম্লান মুখেই একটু হাসে।

আনন্দলাল নমস্কার করে ঘর থেকে বেরোয়।

নীলকেশর একবার বলে মঞ্জরীকে—ওর সঙ্গে গেলেই পারতে।

—যাব না আমার খুশি—হঠাৎ যেন চটে যায় মঞ্জরী।

নীলকেশর খুব শান্ত চোখ দুটো তুলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসে।

কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে।

মঞ্জরী ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটা পায় না। মহোৎসবের গোলমালে হারিয়েছে নিশ্চয়ই।

কিছু না পেয়ে নিজের আঁচলটা দিয়েই নীলকেশরের পুজোর জায়গা ও শোবার জায়গাটা পরিষ্কার করে। পরিষ্কার সবুজ ডুরে শাড়ির আঁচলখানা ঘরের ধুলোয় ময়লা হয়ে ওঠে।

নীলকেশর দেখে। কিছু বলে না।

মাটির কলসীটা টেনে বার করে।

কম্বল চাদর ঝাড়ে।

ঘরের ময়লা পরিষ্কার করে ঘরের কোণে জড়ো করে।

চোখে পড়ে ঘরের কোণে পড়ে আছে একগাছা বাসি শুকনো ফুলের মালা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

চোখের ওপর অষ্টপ্রহরের রাত্রির ছবি ভেসে ওঠে।

এ সেই মালা!

একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকেই চোখদুটো ওর জ্বালা করে।

মাটির কলসী নিয়ে জল তুলতে যায় ঘাটে।

ঘাটে গিয়েও বুকের ভেতরটা যেন মোচড়ায়। চোখ দুটো জ্বলে। কানের পাশদুটো দিয়ে আগুন বেরোয়।

ঘাট থেকে ফিরে এসে দেখে নীলকেশর তেমনি বসে আছে।

সন্ধ্যে হবার আর দেরি নেই।

পশ্চিম আকাশে শাদা টুকরো টুকরো মেঘ কয়েকটি রাঙা হয়ে উঠেছে।

কামরাঙা গাছের পাতায় পাতায় নরম রোদের শেষ আভা।

জলের কলসীটা রেখে রূপমঞ্জরী ঘরের কোণে যায়। আবার দেখে সেই বাসি মালাছড়া।

তুলে নেয় হাতে।

নীলকেশর দেখে। কিছু বলে না।

মঞ্জরী হঠাৎ হাসতে থাকে। খুব হাসে।

—কী হল? অত হাসছ কেন?

মঞ্জরী মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বলে,—সাধু মহারাজের জাত গেছে।

—মানে?

—সাধু আর রইলে কই? এখন তো ঘর পাতলেই হয়। আমার হাতে মালা পরলে!—টানা টানা চোখ দুটোয় ওর প্রাণচাঞ্চল্যের রঙ ফুটে ওঠে। আনন্দে স্থির নয়, খুশিতে বেগবতী হয়ে উঠেছে রূপমঞ্জরী।

নীলকেশর ওর এই অকস্মাৎ চাঞ্চল্যের মানে খুঁজে পায় না।

—কি ব্যাপার বল তো? জাত আমার নেই জানি। জাত থাকলে ঘর থাকত।

মঞ্জরী হাসে,—ঘরও নেই। জাতও নেই।

—ও দুটোই তো নেই। তা অত হাসি কেন?

—নিজেকে আর সাধু বোলো না।

—বলি না তো! সাধু হওয়া তো সহজ নয়। ওটাও একটা অহংকার।

মঞ্জরী হাসে,—সে অহংকার মুছে ফেলো মন থেকে।

—অহংকার মুছতেই তো চাই। আবার এসে জমে,—নীলকেশরের ভাবনার গতিটা একেবারে উলটো। মঞ্জরীর কথার সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে একটুও মিলছে না আজ।

ও ঠিক বুঝতে পারে না মঞ্জরী কী বলতে চায়।

ওর ভাবনার সুতোটা ধরতে পারছে না।

রূপমঞ্জরী সব বুঝেও কিছু বুঝতে পাচ্ছে না। নীলকেশরকে জয় করবার নেশা ধরেছে ওর চোখে। ওকে এমনভাবে অস্বীকার করবে নীলকেশর, এ যেন সইতে পারছে না ও। মঞ্জরীকে স্বীকার করে নিতে হবে। নিতেই হবে।

মঞ্জরী খিলখিল করে হাসে। —সে অহংকার নয়। তোমার বৈরাগীর অহংকার শেষ হয়ে গেছে।

—কবে? কবে এমন সুদিন হয়েছে?

—যেদিন নাম হচ্ছিল সেদিন রাত্রে।

—তাই নাকি। তবে তো তাঁরই কৃপায় সম্ভব হয়েছে। তুমি কী করে জানলে?

মঞ্জরী নীলকেশরের কাছে সরে আসে।

মিটিমিটি হাসি ওর চোখে মুখে। অপরূপ দুষ্টুমির হাসি।

বলে,—আর ঠেলে ফেলে দিলেও যাব না।

ফাল্গুনের এক ঝলক বাতাস এসে লাগে ওদের গায়ে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে নীলকেশরের কপালে। নাকের ওপর।

গাটা ভিজে ওঠে একটু একটু ঘামে।

আবার বাতাস আসে। ঝলকে ঝলকে।

নীলকেশর তাকায় মঞ্জরীর দিকে।

বলে,—সন্ধ্যা হয়ে এল।

—হ্যাঁ। হোক।— মঞ্জরী বসেই আছে।

—জপে বসব এবার।

—জপ আজ না হয় একটু পরেই হবে।

নীলকেশরের মুখে গাম্ভীর্যের কঠিনতা আসে,—না, আলাপ বরং পরে হবে।

নীলকেশর উঠতে যায়।

মঞ্জরী নীলকেশরের খুব কাছে। নীলকেশরের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

বলে,—বোসো।

—না, এখন নয়।

—বোসো একটু। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে মঞ্জরী।

নীলকেশর কোন কথা না বলে উঠতে চায়।

মঞ্জরী খপ করে ওর হাতখানা ধরে।

তাকায় নীলকেশর।

চোখে ওর নেশার বিহ্বলতা।

মঞ্জরীর আর-এক আশ্চর্য রূপ চোখে পড়ে নীলকেশরের।

শান্তভাবে বসে পড়ে বলে,—তুমিও এমন হলে? এমন তো ভাবি নি?

মঞ্জরী একটুও ভয় পায় নি। স্থির চোখে তাকিয়ে বলে,—আমি হই নি। তুমিই আমায় এমন করেছ। তুমি কেন এখানে এলে?

নীলকেশর বলে,—তবে চলেই যাব।

—তোমাকে যেতে দেব না। কিছুতেই ছাড়তে পারব না তোমায়।—গলা কাঁপে ওর।

নীলকেশর তবু শান্ত, বলে,—আমার যে বাঁধা পড়তে নেই।

মঞ্জরীর চোখের বাষ্প গলে পড়ে বুঝি,—তুমি কি পাষাণ?

কথাটা যেন বহুযুগ আগে থেকে ভেসে আসে নীলকেশরের কানে। এই আকাশের তলায় এই মাটিতে এ প্রশ্ন অনাদি কাল থেকে করেছে অনন্ত প্রেয়সী। জবাব মেলে নি।

আজও মিলল না।

নীলকেশর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

—আমি যে মরে যাব। সত্যি মরে যাব।

নীলকেশর প্রশান্ত। একটুও নড়ে না।

—আমার নিজের আর কিছু নেই। আমার সবই যে তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তুমি আমাকে এতটুকু দেবে না। ভিক্ষে দেবে না?

রূপমঞ্জরীর জমানো কথাগুলো একটা একটা করে ছাড়া পাচ্ছে আজ। যা সত্যি তা বলতে একটুও ভয় করছে না। একটুও লজ্জা হচ্ছে না।

আজ রূপমঞ্জরীর জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। নীলকেশর সত্যকে কেন স্বীকার করবে না? এত ভীতু নীলকেশর?

বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার জমে উঠছে ঘরে।

নীলকেশর স্থির হয়ে বসে আছে। চোখ দুটো নামিয়ে বসে আছে।

আজীবন ব্রহ্মচারী নীলকেশর। ব্রতী নীলকেশর।

রূপমঞ্জরী আজ ওর সব ভাসিয়ে দিতে চায়। এ জন্মটা কি বৃথাই যাবে ওর আকর্ষণে?

যোগমায়ার অনিবার্য আকর্ষণ।

নীলকেশর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

কৃষ্ণ-প্রেমের সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে আজ।

ও আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে,—তুমি কী চাও?

—কিছু না। শুধু তোমাকে দেখতে চাই, তোমার কথা শুনতে চাই, তোমার কাছে থাকতে চাই।

যেন স্বপ্নের ঘোর নীলকেশরের।

বলে,—আমি তোমার কে?

—রাগ-কৃষ্ণ। তুমিই আমার ঠাকুর। আমাকে সেবা করতে দাও। তোমার সঙ্গে আমায় নাও।

মঞ্জরী ওর দুখানা হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নেয়।

নীলকেশরের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা। রূপমঞ্জরীর স্পর্শে ওর হাত দুটো পুড়ে যায় যেন। জ্বলে যায়! নীলকেশর হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয়।

মঞ্জরী ঘেমে উঠেছে। মাথাটা কেমন শূন্য মনে হয় ওর।

নীলকেশর শান্ত হয় আবার।

—তুমি যা চাও তা হয় না।

মঞ্জরী নীরব।

—আজীবনের সব সাধনা ভাসিয়ে দিতে পারব না।

মঞ্জরীর একটা কথা বলবার শক্তি নেই আর।

—আমাকে ক্ষমা করো। আমার ওপর রাগ কোরো না।

হাত জোড় করে নীলকেশর। তাকায় মঞ্জরীর দিকে।

মঞ্জরীর চোখ দুটোয় এক জ্বালা। তাকায় নীলকেশরের দিকে।

চোখ দুটো জলে ওঠে।

উঠে পড়ে মঞ্জরী।

অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

ঘোর সন্ধ্যায় তখন পাখিগুলো অনবরত ডাকছে কামরাঙা গাছটার ডালে ডালে।

আকাশটা ধূসর। কিছু কিছু মেঘ জমেছে।

একটুও বাতাস নেই।

টলতে টলতে কলাবাগানের দিকে এগিয়ে যায় মঞ্জরী।

আর আসবে না মঞ্জরী। আর আসবে না কোনদিন।

আজই শেষ অভিসার ওর জীবনে।

১৩

সুশান্ত হালদার এল উমা মল্লিকের ঘরে। রোববারের সকাল। একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠেছিল উমা। আজকাল শরীরটা কেমন দুর্বল মনে হয়। সকালে ঘুম ভাঙে না। ঘুম যদি বা ভাঙে উঠতে ইচ্ছে করে না। দু কাপ চা দিয়ে যায় চাকরটা। দুকাপ চা খাবার পর উঠতে হয়। যেদিন জেগে শুয়ে থাকে, সেদিন কতকগুলো অলস চিন্তা এসে ভিড় করে মাথায়। কাজের ভাবনা নয়। বাজে ভাবনাই বা বলা যায় কি করে? এ ভাবনার সঙ্গে তার জীবনের প্রতিটি দিনরাত জড়িয়ে আছে।

আনন্দলালের ভাবনা।

আজও তো এল না আনন্দলাল।

এখন তো সে নিজেই যায় প্রতিদিন বিকেলে মেসের দরজায়।

যার সঙ্গেই দেখা হোক, জিজ্ঞেস করে,—আনন্দবাবু এসেছেন?

মেসের লোকেরা একটু মুচকি হাসে, কী ভাবে কে জানে।

লজ্জা যে করে না এমন নয়। তবু সব লজ্জা মুছে ফেলে জিজ্ঞেস করতে হয় আবার—এখনও আসেন নি?

কেউ হয়তো বলে,—ও কি আর আসবে? মেসের কতকগুলো টাকা বাকি যে!

উমা বলে,—টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। আসে নি তাহলে।

লোকটি অবাক হয়ে তাকায়। আনন্দলালের টাকা মিটিয়ে দিয়েছে?

কে এই মেয়েলোকটি? আনন্দলালের কে হয়?

একটা কিছু আন্দাজ করে ওরা কেউই জিজ্ঞেস করে না কিছু।

শুধু বলে,—আসে নি।

আসে নি—শুনেই ফিরতে হয় হতাশ হয়ে প্রতি সন্ধ্যায়।

কিছুদিন পর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে নিজের ঠিকানা দেয় উমা মল্লিক।

—আনন্দবাবু এলে এই ঠিকানায় একটু খবর দেবেন।

ম্যানেজার টাকাটা ওর কাছ থেকেই পেয়েছিল, তাই খাতির করে।

বলে,—আপনার কথা কিছু বলতে হবে কি!

—না, বলবার কিছু দরকার নেই। শুধু আমায় একটা খবর দিলেই হবে।

—নিশ্চয়ই দেব।

উমা ফিরে আসে।

তবু নিশ্চিন্ত হয় না। যদি ম্যানেজার খবর দিতে ভুলে যায়।

তবু মাঝে মাঝে নিজে যায়। খবর নেয়। হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

কিছুদিন সুশান্ত হালদারও আসে নি। আজ এসেছে। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে এসে বসেছে উমা মল্লিক।

সুশান্ত হালদার এসে হাজির।

ওকে দেখে খুব ভালো না লাগলেও একটু হেসে জিজ্ঞেস করে উমা,—কি খবর! এত সকাল সকাল।

—খবর খুব জরুরী। —বলে মেয়েলি ভঙ্গীতে চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করে নেয় সুশান্ত।

— এমন জরুরী খবর! বসুন। চা বলে আসি।

ভেতরে গিয়ে চা বলে আসে চাকরটাকে। দুখানা বিস্কুট দিতেও বলে।

এ লোকটাকে দেখলেই আনন্দলালের কথা বেশী মনে পড়ে যায় ওর। কি জানি কেন মনে মনে একটা তুলনা এসে পড়ে আপনা আপনি।

অতি ভালো মানুষ সচ্চরিত্র ভীতু পণ্ডিত সুশান্ত হালদার। আর অতি দুশ্চরিত্র জুয়াড়ী দুঃসাহসী আনন্দলাল। তবু আনন্দলালের তুলনা নেই। মেয়েদের জীবনে আনন্দলাল অতুলনীয়।

—কি খবর? এসে চেয়ারটায় বসে উমা মল্লিক।

ওপাশের ঘরে গিয়ে চুলটা একটু গুছিয়ে মুখে একটু পাউডার ঘসে আসতে পারত উমা। কিন্তু তা করে না।

সুশান্ত হালদার মুখটা নীচু করে বলে,— মানে সুখবর।

—কি এমন সুখবর?

আসবার আগে অনেক কথা ভেবে এসেছিল সুশান্ত। কিন্তু এখন মুখে কথা যোগায় না। বলে—অনেক চেষ্টা করে,— কী খাওয়াবেন বলুন?

বলেই আবার ভয়ে ভয়ে তাকায় উমার দিকে।

উমা হাসে,—খবর না শুনে খাওয়াই কি করে?

এর ভেতর চা-বিস্কুট আসে।

—নিন, চা আগেই খাওয়াচ্ছি, এবার বলুন।

—আপনার চাকরি হয়ে গেছে।

—চাকরি তো করছি। কোথায় আবার চাকরি হল?

—ওই যে সেই আপনি বলেছিলেন। বাইরের কলেজে চাকরির কথা।

—ও ! হ্যাঁ, বলেছিলুম বটে। কোথায় হল ?

সুশান্ত মুখ তুলে তাকায় সাহস করে—রঘুনাথপুর কলেজে, ছোট কলেজ। তা হোক। মাইনে ভালোই দেবে। আপনি একটা দরখাস্ত করে আমায় দিন।

উমা একটু বিপদে পড়ে। এখন ও কী করে যাবে বাইরে ? আনন্দলাল যদি এসে পড়ে ? যদি এ বাড়িতে তার খোঁজে আসে ? প্রতিটি মুহূর্ত সে এখন আনন্দলালের প্রতীক্ষায়। আনন্দলাল যে ওর জীবনে কতখানি, যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন বুঝতে পারছে কথাটা। ও কিছুতেই যেতে পারবে না। প্রয়োজন হলে আজীবন প্রতীক্ষা করতে হবে।

বলে,—অত দূরে একা একা যাওয়া ?

সুশান্ত বলে,—একা একা যাওয়া সত্যিই মুশকিল। ওখানকার জমিদারদের কলেজ, তিনিও আবার একা একা কোন অধ্যাপিকার থাকা পছন্দ করেন না। বিবাহিতা অধ্যাপিকা চাইছেন।

—তবে তো হবেই না।

—না তা নয়। সকালে মেয়েদের ক্লাস, দুপুরে ছেলেদের ক্লাস। আমিও ছেলেদের সেকশনে চাকরি নিচ্ছি ওই কলেজে।

—তাই নাকি ? বেশ ভালো তো।

—না, মানে, সেই কথাই বলছিলুম। মানে দুজনে যদি যাই তবে তো আর আপনিও একা থাকবেন না, আমিও একা থাকব না !

চমকে ওঠে উমা মল্লিক।

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট।

তবু মনোভাব গোপন করে একটু হেসে বলে,—হুঁ !

সুশান্ত বলবার এমন সুযোগ ছাড়বে না আজ। বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে। করুক, কথাগুলো ভালো করে ভাবতে পারছে না। তা হোক। বলতেই হবে আজ, এমন প্ল্যান একটা মাটি করতে পারবে না ও।

—তাই বলছিলুম কি এখানে যদি অভিনয়ের খাতিরে—।

উমা মল্লিকের কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। তবু হেসে বলে,—বলুন অভিনয়ের খাতিরে—তারপর?

—মানে সত্যি সত্যি নয়। আমরা যদি বিবাহিত বলে পরিচয় দিই।

উমা মল্লিক চুপ করে বসে থাকে।

সুশান্ত হালদার সবটুকু বলতে পেরেছে।

পরম তৃপ্তিতে চায়ে চুমুক দেয়।

বেশ সাহস হচ্ছে আজ, বলে,—আপনি ভেবে দেখুন!

উমা মল্লিক একটা কথাও বলে না।

চা খাওয়া শেষ হয় সুশান্তর।

এতক্ষণে উমা মল্লিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

বলে,—চা খাওয়া হয়েছে আপনার?

তাকায় ওর দিকে সুশান্ত হালদার।

—একটা কথা আপনাকে বলব। কথাটা শুনেই ঘর থেকে চলে যাবেন আর একটা প্রশ্নও করবেন না।

সুশান্ত ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—অনেক আগেই কথাটা আপনাকে বলা উচিত ছিল। ভুল হয়েছে আমারই। আমার বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। হয়তো আজও আমার স্বামী বেঁচে আছেন।

সুশান্ত হালদার বিস্ফারিত চোখে ওর সিঁথির দিকে তাকায়।

—ভাবছেন সিঁথির সিঁদুর নেই কেন? কোন একটা কারণেই বিয়েটাকে অস্বীকার করবার একটা ছেলেমানুষি চেষ্টা করেছিলাম। সে ছেলেমানুষি মূর্খামির ফল আজ ভোগ করছি। জানতাম না যে আর পাঁচজন মেয়ের মতো আমিও আমার স্বামীকে এত ভালোবাসি। অবাক হবেন না। তাঁর নাম করলে আপনি চিনবেন। অনেকেই চিনবে। তবু নাম করব না। যদি কখনও তিনি ফেরেন, আলাপ করিয়ে দেব আপনার সঙ্গে। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।

হাতদুটো তুলে নমস্কার জানায় উমা মল্লিক।

আর একটা কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুশান্ত হালদার।

ও চলে যাবার পর বিছানার ওপর ধীরে ধীরে এসে বসে উমা।

মনে মনে ওর বড় কষ্ট হয়। জোলো তালশাঁসের মতো সুশান্তর বিস্ফারিত চোখ দুটোর কী যে ভাষা তা ও বেশ বুঝতে পারে।

ও জানে লোকটি হয়তো বহু দীর্ঘশ্বাসে কুঁকড়ে যাবে।

অত বড় পণ্ডিতেরও চোখ দুটো জলে ভরে উঠবে।

কষ্ট হয় উমার। মানুষটি বড় ভালো। ও যে আঘাত আজ পেল এর পর আর কোনদিন আসবে না। গুমরে কাটাবে আজীবন।

উপায়ই বা কি?

সত্যি বেদনা অনুভব করে উমা। মনে মনে ভাবে যদি কখনও আনন্দলাল আসে। আনন্দলালকে নিয়ে নিজে যাবে ওর বাড়ি। ওকে বন্ধু বলে স্বীকার করবে আবার।

কিন্তু আনন্দলাল কি আসবে?

উমা মল্লিক এবার বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে খানিকটা হতাশ হয়ে।

ফাল্গুনের বেলা দেখতে দেখতে বেড়ে যায় মনে হয়। রোদের তাপ বড় বেশী। বেলা সাড়ে নটায় মনে হয় বুঝি অনেক বেলা হয়ে গেছে।

সাদা ঝলমলে আকাশ। শহরে রাস্তা-ভরা রোদ্দুর।

মনের অবসাদ দেহের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

চাকরটা আসে,—আজ কি বাজার হবে দিদিমণি?

একটা হাই তোলে উমা,—যা হোক নিয়ে আয়।

—মাংস আনব? আজ রোববার।

—না মাংস ভালো লাগে না। একটু তাজা মাছ নিয়ে আয় বরং।

শরীরটা উমার মোটেই ভালো যাচ্ছে না। বিশেষ করে হজমের ব্যাঘাত হচ্ছে বড় বেশী।

—আর দেখ, দুটো নেবু আনিস বাজার থেকে।

চাকর চলে যায়।

উমা আবার গড়াতে থাকে বিছানায়।

যেদিন আনন্দলাল চলে গেল সেদিনের মুখটা মনে পড়ে।

অবিন্যস্ত চুল, ময়লা জামাকাপড়, মুখখানি শুকনো। হয়তো বা দুদিন কি তিনদিন খায় নি কিছু।

এসে টাকা চাইলে কয়েকটা।

টাকা তো উমার ছিল, জমানোও কিছু আছে।

তবু কেন অমন করে অপমান করলে উমা ?

অপমান নয়, সুতীব্র অভিমানের প্রকাশ।

কেন আনন্দলাল উমাকে গ্রহণ করল না ? কেন ও উমার গোপন বেদনা বুঝল না। উমা তো আনন্দলালের জীবনে এক সাধারণ পথচারিণী মেয়ে নয়।

উমা আনন্দলালের স্ত্রী।

স্ত্রীর অধিকার যে অন্তরের ? সে কথা কেন স্বীকার করে নেবে না আনন্দলাল।

তবু সেদিন অমন করে আঘাত না করলেই পারত।

হয়তো বা ওই আঘাতেই আনন্দলাল আজ নিরুদ্দেশ।

অনুতাপে আতপ্ত মন ওর বার বার ক্ষমা চায় আনন্দলালের উদ্দেশ্যে। আর সে কখনও অমন করে বিঁধবে না। ভালোবাসায় মানুষকে জয় করা যায়, ও তাই করবে।

এবার ফিরে আসুক আনন্দলাল।

বালিশের ওপর মুখটা গুঁজে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে উমা, যতক্ষণ না চাকর বাজার থেকে এসে আবার ডাকে।

১৪

ঠিক সন্ধ্যার মুখে প্রাণটা আনচান করে ওঠে আনন্দলালের। বহুদিনের অভ্যেস ভুলেও ভোলা যায় না। মনের তৃষ্ণায় গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কোহলের তৃষ্ণা। শরীরটা অবসন্ন হয়ে টলে পড়তে চায়। মাথাটায় যন্ত্রণা হয়।

স্নায়ুর এই আক্ষেপ বিক্ষেপ সহ্য করতেই হবে ওকে। স্নায়ুগুলো সব নিজেদের খুশিমতো তার ওপর এক ধ্বংসমুখী অধিকার বিস্তার করবে, এ চলবে না। কিছুতেই চলবে না। মনটাকে দৃঢ় করে বাঁধবার চেষ্টা করে আনন্দলাল।

সন্ধ্যা উতরে যায়। মাথাটা ধরে বসে থাকে আনন্দলাল। একটু পরেই কানে এসে বাজে সুমধুর গুঞ্জন—মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ। নাম সংকীর্তন গায় নরোত্তম দাস॥

ছোট ছোট করতাল দুটির তালে তালে আওয়াজ, খুব ধীরে খুব আস্তে আস্তে গাইছে। মঞ্জরী গাইছে। রূপমঞ্জরী।

ভাবতে বড় মধুর লাগে আনন্দলালের।

এবার তুলসী-চন্দনে বৈকালী নিবেদন হবে।

প্রণাম করবে রূপমঞ্জরী।

গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করবে। অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করবে।

আনন্দলাল দেখেছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে এর আগে।

প্রণাম যখন মঞ্জরী করে তখন কিছু রেখে ঢেকে প্রণামটা সেরে নেওয়া নয়। একেবারে সব বিলিয়ে দেয় যেন। সব ঢেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে।

এমন করে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।

নিজেকে ওই পরিবেশে চিন্তা করে আনন্দলাল এ কথা পরিষ্কার বোঝে।

মঞ্জরী একটু পরেই ঘরে ঢোকে। ছোট পাথরের রেকাবিতে একটু ছানা, একটু মিছরি। বৈকালীর প্রসাদ। আনন্দলালের কাছে আসে।

—কি হল? মাথাটা ধরেছে? নামকীর্তনের পর ওর কণ্ঠে যেন মধু মাখা থাকে

আনন্দলাল মুখ তোলে, একটু হাসে,—হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই এমন হচ্ছে। শহরে গেলে হয়তো আরও বাড়বে, তাই এখানে থাকব আরও কদিন।

—প্রসাদ নিন।

আনন্দলাল তাকায় ওর দিকে। মুখখানা আজ যেন ম্লান মনে হয়। তবু ম্লান হলেও মধুর শীতল ভাবটি ওর চোখে আছেই। অত্যন্ত উত্তেজনা, চকিত চাঞ্চল্য কখনো ওর চোখে মুখে দেখে নি আনন্দলাল। ওর কাছে রূপমঞ্জরী সবসময়েই মধুর।

মদের তৃষ্ণা ভোলাতে পারে রূপমঞ্জরীর এই ঠাণ্ডা নরম রূপ। আনন্দলালকে অন্য মানুষ করে তুলতে পারে, আকাশের মতো শান্ত বিরাট করে তুলতে পারে। রূপমঞ্জরী কি তার জীবনে আসতে পারে না?

—এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াবে?

জল আনতে যায় মঞ্জরী।

ওর হাতের ঠাণ্ডা জল খেলে আনন্দলালের দামাল চঞ্চল স্নায়ুগুলো শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কারণ বুঝতে পারে না আনন্দলাল, অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না।

জল নিয়ে আসে মঞ্জরী। ওকে দেয়।

সবটুকু জল খেয়ে নেয় ও।

ঠাণ্ডা জল গলা থেকে নামে বুকে। ঠাণ্ডা হয়ে আসে শরীর।

আনন্দলাল চুপ করে বসে থাকে।

মঞ্জরী দেখে জল খাবার আগেই প্রসাদটুকু খেয়েছে আনন্দলাল।

—জ্বর হয় নি তো ?—মঞ্জরী ওর নরম হাতখানা ছোঁয়ায় আনন্দলালের কপালে।

আনন্দলালের চোখদুটো বুজে আসে।

—আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান ?

—কি ?—জিজ্ঞাসা করে মঞ্জরী।

—আবার আমার অসুখ হোক।—চোখদুটো আধ-বোজা রেখেই বলে আনন্দলাল।

—কী যে বলেন ?

—সত্যি।

—এমন শখ আবার মানুষের হয় নাকি ?

—হয়। জ্বরের কষ্টের চেয়েও অনেক বেশী আনন্দ পাবার সম্ভাবনা থাকলে হয়।

—জ্বরে আবার আনন্দ! খেপেছেন নাকি ?

আনন্দলাল বলে,—জ্বরে নয়। তোমার সেবা পাবার লোভ। শুধু সেবাও নয়। ওষুধ যখন খাওয়াতে আস তখন ভালো লাগে না। তোমার ওই হাতখানা আমার কপালে যখন থাকে, কী ভালো যে লাগে!

রূপমঞ্জরী একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—কিছু মনে কোরো না। যা সত্যি মনে হয়, তাই বললাম। মিথ্যে বানিয়ে বলি নি।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে মঞ্জরী,—আর কারো তো মনে হয় না ? কারো কারো আমার ছোঁয়া বিষ বলে মনে হয়।

বলে আনন্দলালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলে মঞ্জরী,—সত্যি বলছি। বিশ্বাস করুন।

আনন্দলালও হাসে,—এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে সে মানুষ নয়, পাষণ্ড।

মঞ্জরী মনে মনে বলে,—পাষণ্ড নয়। পাষাণ। মথুরার কৃষ্ণের মতোই পাষাণ।

মুখে বলে,—থাক, আপনার আর জ্বর হয়ে কাজ নেই। এমনিতেই কপাল টিপে দেওয়া যাবে।

—এমনি এমনি ভালো লাগবে না?

মঞ্জরী বলে,—তবে এক কাজ করুন। ঘাটে গিয়ে রাতদুপুর পর্যন্ত ডুবিয়ে আসুন। কাল জ্বরকে আসতেই হবে। একা নয়, সর্দিকাশিদের সঙ্গে নিয়ে আসবে।

বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে মঞ্জরী।

আনন্দলালও হাসে।

—বুদ্ধিটা মন্দ নয়। যাই সাধুভাইকে জিজ্ঞেস করে আসি।

মঞ্জরীর মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়, আনন্দলাল অতটা লক্ষ্য করে না।

আনন্দলাল পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতে দিতে বলে,—মনে নেই, আজ সন্ধ্যেবেলা গান শুনতে চেয়েছেন? যাই একবার। তানপুরাটা কই?

চটিটা পায়ে গলিয়ে নেয় আনন্দলাল! তানপুরাটা নামিয়ে নেয়।

মঞ্জরী মুখটা নীচু করে পাথরের রেকাবিটা আর গেলাসটা তুলে নেয়।

মেজেটা একটু হাত দিয়ে সাপটে নেয়।

নিজেকে সংযত করে নেয় মুখ নীচু করে।

মুখ তুলে সহজ স্বরে বলে,—বেশী রাত করবেন না যেন!

—না, না। সাধু-টাধুর সঙ্গে আমার ঠিক বনবেও না। বনবে তোমাদের। আমি যাব আর আসব। শশী ফিরলে একটু যেতে বোলো ওখানে। গান যদি গাইতেই হয়! ওরও শেখা হবে।

—বলব।

—শশীকে নিয়ে কাল থেকে একটু বসব ভাবছি, রাত্রের দিকে। কয়েকটি ভালো জিনিস ওকে দোব। কতকগুলো সুর আছে, বিস্তারের ভঙ্গী আছে, কাউকে দিই নি। ওকে দোব।

—দাদার ওপর এত সদয় কেন?—হাসতে হাসতে সহজ হবার চেষ্টা করে মঞ্জরী।

—সদয় নয়। মানে সত্যি কথা বলতে গেলে ওর অন্ন খাচ্ছি তো। তাছাড়া ওর এখানে না আসলে হয়তো এবার মরেই যেতাম। ওর ঋণ শোধ করবার নয়।

আনন্দলাল গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—জীবনে কৃতজ্ঞতা কথাটা কী জানতাম না। আজ ওর ওপর কৃতজ্ঞ হতে ইচ্ছে হচ্ছে। আরও একজনের ওপর।

মঞ্জরী ওর গম্ভীর গলা শুনে চুপ করে থাকে।

আনন্দলাল একটা নিঃশ্বাস চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রূপমঞ্জরী রেকাবি গেলাস এনে রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে রান্নাঘরের ভেতরে যায়।

সরমা রাঁধছিল।

ঘাড়টা ফিরিয়ে বলে,—ছেলেটাকে একটু খাইয়ে দিলে তো পারতে ভাই। কি অত গল্প কর মাস্টারের সঙ্গে।

—গল্প নয়। বলছিল মাথাটা আবার ধরেছে।

—তা অত বক বক করলে মাথা ধরবে না গা!

—তুমি কি রাগ করলে নাকি বৌদি?

—রাগ করব না যদি আমার একটা কথা শোন। শোন।

সরমা মঞ্জরীর কানে কানে কি একটা কথা বলে।

মঞ্জরী—ধ্যাত—বলে মাথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

সরমা হেসে ওঠে,—সত্যি, তোমার দাদাও বলছিল। ও তো বামন। চক্রবর্তী ওরা। আর আমরা চাটুজ্জে। তাহলে রাজী?

—বাজে কথা এত বলতে পার তুমি।—মঞ্জরী হাসতে থাকে।

—বাজে কথা নয় ঠাকুরঝি।—একটু যেন গম্ভীর হয় সরমা।—সত্যি, বামুন-বোষ্টমের ঘর বলে তেমন খারাপ দেখাচ্ছে না। নইলে মুখ দেখানো যেত না।

মঞ্জরী বোঝে। বোঝে ওর বয়স বাড়ছে।

মুখটা নিচু করে বসে থাকে।

—কিছু মনে কোরো না ভাই। মাস্টারের মতো পাত্র পেলে আমরা বর্তে যাই। রূপে গুণে রোজগারে। ভাবছি ওই-ই হয়তো রাজী হবে না।

মঞ্জরীও গম্ভীর হয়ে বলে,—আমিও একটা কথা বলি বৌদি। এতদিন এখানে থাকবার পর মাস্টারকেই যদি পাত্র স্থির কর, তাতেও মানুষ খুব সুনাম করবে না।

সরমা বলে,—বিয়ে হয়ে গেলে দুর্নাম করল তো বয়ে গেল!

—বয়ে যায় না। আমার বাবার নামে কেউ কিছু বললে সেটি আমায় বিঁধবে বেশী।

খোঁচাটুকু হজম করে সরমা পালটা বলে,—তা বটে, আইবুড়ো থাকলে শ্বশুরঠাকুরের সুনামে গা ছেয়ে যাবে।

কথাগুলো ক্রমশ তেঁতো হয়ে উঠছে।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে রান্নাঘর থেকে বেরোতে যায়।

সরমা উনুনের ওপর থেকে তরকারি নামিয়ে বলে,—খোকাকে তুলে নিয়ে এস। অবেলায় ঘুমুচ্ছে। চাট্টি খেয়ে নিক।

মঞ্জরী নীরবে গিয়ে খোকাকে নিয়ে আসে। সন্ধ্যা উতরে যায়। বাতাসে বাতাসে মাঝে মাঝে কানে এসে বাজে তানপুরার গুঞ্জন। সুরের একটু একটু আভাস। শশিনাথ এসে পড়ে এর ভেতর।

মঞ্জরী খোকাকে খাওয়াতে খাওয়াতে দাদার উদ্দেশ্যে বলে,—তোমায় মাস্টারমশাই যেতে বলেছেন।

শশিনাথ রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায়—কোথায়?

—গোসাইয়ের ভিটেতে।

—মাস্টার বুঝি সেখানে গেছে? কই গো। এক বালতি জল দাও।

শশিনাথ ঘরের দিকে এগোয়।

হাতের চটের ছোট থলেটা রাখে দাওয়ায়।

সরমা আসে। চটের থলেটা নিয়ে ঘরে রাখে। কুয়োর ধারে যায় বালতি নিয়ে জল তুলতে।

—হাতমুখ ধুয়েই বেরোব। তানপুরোর আওয়াজ শুনছি! সাধু ভাইয়ের ওখানে জমিয়েছে আজ মাস্টার!

সরমা কথা বলে না। মঞ্জরীর সঙ্গে তিক্ত কথা-কাটাকাটিতে মনটা ওর বিষিয়ে আছে।

জলের বালতি সামনে রেখে বলে—তাড়াতাড়ি ফির।

শশিনাথ হাসে,—তা বলা যায় না। জমে গেলে দুপুর রাত। একবার গান জমে গেলে খাওয়া ঘুম সব মাথায় উঠে যায়।

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে বলে শশিনাথ—এক গেলাস জল দাও।

সরমা এক টুকরো পাটালি গুড় আর এক গেলাস জল দেয়।

শশিনাথ জল খেয়ে তখুনি গোসাইয়ের ভিটের দিকে রওনা হয়।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসে। যত কাছে আসে শুনতে পাওয়া যায় আনন্দলালের গলার সুরবিলাস। কী ধরেছে?

শশিনাথের বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে ওঠে।

বোধহয় পটদীপ।

হ্যাঁ। পটদীপই তো। স্পষ্ট শুনতে পায় শশিনাথ।

ঘরের সামনে এসে একটু স্তম্ভিত হয়।

একি একটাও বাইরের লোক নেই।

চোখদুটো বুজে বসে আছে আনন্দলাল।

সামনে বসে আছে স্তিমিত চোখ মেলে নীলকেশর।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শশিনাথ।

শুধু সুর ধরেছে আনন্দলাল। আলাপ। মৃদু গুঞ্জন।

অঙ্গুলির আলতো ছোঁয়ায় তানপুরার সুর উঠে মিশিয়ে যায়।

পটদীপের এত সূক্ষ্ম প্রাণঢালা রূপ কখনও শোনে নি শশিনাথ। শোনে নি এমন মধুর আলাপ!

মাস্টার বুঝি প্রাণ ঢেলে দিয়েছে আজ।

ঘরে ঢুকলে পাছে ধ্যান ভেঙে যায়, সুরের এমন ভাসা-ভাসা রূপ ভেঙে যায়। তাই শশিনাথ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে।

অনেকক্ষণ আলাপের পর আনন্দলাল চোখ খোলে।

গানের একটি কলি ধরে।

এবার শশিনাথ ঘরে ঢোকে।

নীলকেশর স্থির হয়ে শুনছিল।

শশিনাথকে দেখে একটু হেসে বসতে ইসারা করে। শশিনাথ বসে।

আনন্দলালও একটু হাসে!

একটু পরে সুর থামিয়ে বলে—এবার আপনার? মিষ্টি একটি কের্তন।

নীলকেশর মৃদু হাসে—এত মিষ্টি সুর যাঁর ভেতর থেকে বেরোয়, সে তো মধুতে ভরা।

—ওসব কথা রাখুন—হাসে আনন্দলাল।

নীলকেশর বলে,—শুধু কথা নয় ভাই। নাদ অমৃতরস। নাদ ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদি ভাববিভাবন।

এ যে সত্য।

আনন্দলাল মুখ নিচু করে,—সত্যি স্বীকার করি। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে যা পেলাম, তাকে ঠিক ঠিক সাধন করতে পারলাম না। জানেন না সাধু ভাই, গুরুর মুখে শুনতাম রামকেলী সকালে। বলতেন, তেমন তেমন গাইতে পারলে রামকেলীর আহ্বানে সূর্যের রাঙা জ্যোতি দেখা যায়। রামকেলী, বলতেন, ভৈরবের প্রেয়সী। আবার হয়তো গাইতেন যোগিয়া। ভোরের আকাশে বিশুদ্ধ ঝংকার তুলত যোগিয়ার তান। বলতেন, যোগিয়ায় কি মনে হয় জান। বিশ্ব গ্রহতারা সব যেন ভোরের অনন্ত আকাশকে প্রণাম জানাচ্ছে! আমার কিন্তু কিছুই হল না।

চোখদুটো বিষাদে ভরে ওঠে আনন্দলালের।

—আপনার গুরু কে?

—একজন মুসলমান।

গম্ভীর স্বরে বলে নীলকেশর,—তাঁকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি।

আনন্দলালের গলাটা ধরে যায়,—তিনি এ পৃথিবীতে আর নেই। তাঁকে আর কদিনই বা পেলাম!

বলতে বলতে বিভোর হয়ে যায় আনন্দলাল,—একসময় সুরে ডুবে ছিলাম। বিশ্বাস করুন। একেবারে ডুবে ছিলাম। জৌনপুরী, গৌড়সারঙ্গ, বেলাবলী, মধুমাধবী, ভীমপলশ্রী, মুলতান, পুরিয়া, বাগেশ্বরী, কাফি, মল্লার,—অনন্ত সুর উঠত ভেতর থেকে। এক থেকে হাজার। মাতাল হয়েছিলাম সুরে। তারপর সত্যি মাতাল হলাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনন্দলাল।

এমন করে নিজের কথা বলতে কেউ কখনও শোনে নি আনন্দলালকে।

আনন্দলাল হঠাৎ যেন আজ প্রাণের দরজা খুলে দিয়েছে।

অবাধে বেরিয়ে আসছে কথাগুলো।

নীলকেশরকে ভালো লেগেছে আনন্দলালের।

খুব বেশী ভালো লেগেছে। নইলে এত কথা কাউকে বলে না আনন্দলাল।

আনন্দলালের আপনা আপনিই মনে হয়েছে। বললে নীলকেশরই হয়তো কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে। আর কেউ নয়।

শশিনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

হঠাৎ বলে আনন্দলাল,—অনেক জ্বালা আছে সাধুভাই। সে আপনি বুঝবেন না। এখানে এসে কিন্তু বড় ভালো লাগছে।

—ভালো লাগবেই। এ যে গোসাইয়ের গ্রাম।

—তা জানি না ভাই। ভালো লেগেছে এই জানি। এর আগে ভালো লাগা কাকে বলে এমন করে জানি নি।

নীলকেশর শান্ত চোখে তাকায়।

আনন্দলাল বলে,—কই আপনার নামকীর্তন একটু শুনি।

নীলকেশর হাসে,—গান নয়। একটু শ্রীভাগবত শুনুন বরং।

চোখদুটো বোজে নীলকেশর।

বলে,—কেন আপনার এ গাঁ ভালো লাগবে না?

তস্যারবিন্দ নয়নস্য পদারবিন্দ

কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসীমকরন্দ বায়ুঃ।

অন্তর্গত স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষর জুযামপি চিত্ততন্বোঃ ॥

কমলনয়ন সেই কৃষ্ণের পায়ে দেওয়া পদ্মকেশর মেশানো তুলসীর বাতাস আঘ্রাণ করে ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির চিত্তে দেহে ক্ষোভ জন্মেছিল। চিত্তে আনন্দ আবেশ, শরীরে রোমাঞ্চ। মুহুর্মুহু কেঁপেছিল তাঁরা।

এ গাঁয়ে যে সেই বাতাস ভাই।

প্রদীপের আবছা অন্ধকারে নির্জন প্রান্তরসীমায় ছোট ঘরটিতে বসে সত্যিই রোমাঞ্চ লাগে।

আনন্দলাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নীলকেশরের দিকে।

আশ্চর্য! ভাগবত যে এমন সে তো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

নীলকেশরের প্রাণঢালা কথাগুলো যে গানের চেয়েও মধুর মনে হয়।

ভাগবত এত মিষ্টি!

আনন্দলালের আগেকার ধারণা উলটে পালটে এক রসাবেশে ভরে দেয় ওকে।

মৃদু বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপে।

একটির পর একটি শ্লোক বলে যায় নীলকেশর।

ও আনন্দলালকে শোনায় না, নিজেকে শোনায়। আপনা আপনি বলে যায়। ভিজে ভিজে চোখদুটো ওর স্তিমিত হয় মাঝে মাঝে।

যে পরিবেশ কল্পনা করা যায় না, তাই আজ সত্য হচ্ছে।

আনন্দলাল তানপুরোটা কোলে নিয়ে বসে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

শশিনাথ মুখটা নিচু করে হাতজোড় করে বসে থাকে।

১৫

প্রায় রোজই সন্ধ্যায় আসে আনন্দলাল নীলকেশরের কুঁড়ে ঘরে। শশিনাথও আসে একটু দেরিতে। আজও বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল আনন্দলাল।

মঞ্জরী এসে দাঁড়াল।

—আজও বেরোচ্ছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—অসুখ থেকে উঠে রোজ এত রাত করলে শরীর টিঁকবে ?

মঞ্জরী গম্ভীর হয়ে বলে।

আনন্দলাল হেসে ফেলে,—বাবাঃ! তুমি যে শাসন শুরু করলে ?

মঞ্জরী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। লজ্জায় ওর মুখটা নিচু হয়।

বলে,—না, বলছিলুম। আবার যদি অসুখ হয়।

—হয় তো হবে!

মঞ্জরী কথাটাকে হালকা করবার সুযোগ পায়,—কেন, সেবা পাবার ইচ্ছে বুঝি ?

—ষোল আনা।

বলে একটু থেমে আবার বলে,—কই তুমি তো আর যাও না ?

—ওরে বাস্!—আমার মরবার সময় নেই, তা আবার বেড়ানো!

আনন্দলাল হেসে ফেলে ওর বলবার ভঙ্গী দেখে।

বেরোয় ঘর থেকে।

—সকাল সকাল ফিরবেন কিন্তু।

—সাধুভাই যদি ছাড়ে। লোকটা ছাড়তে চায় না কিছুতেই। এরপর কোনদিন দেখবে আমিও গেরুয়া-টেরুয়া পরে করতাল নিয়ে বসে গেছি।

—তবে বেশ মজাই হয়।—হাসে মঞ্জরী ছেলেমানুষের মতো বলে

আবার,—বিয়ে করেন নি, সংসার নেই, গেরুয়া পরলেন তো কার কি এসে গেল।

হঠাৎ গম্ভীর হয় আনন্দলাল।

এক মুহূর্তের জন্যে ওর মনের ভেতর ভেসে ওঠে উমা মল্লিকের মুখখানা। বিষাদে ভরা অথচ চাঁপা ঠোঁটদুটিতে ঘৃণা করবার প্রাণপণ চেষ্টা। চোখভরা সমবেদনা।

উমা কোথা আছে কে জানে!

জোর করে মনটাকে ফেরায় আনন্দলাল। উমাকে মুছে ফেলতে চায় ও। বিগত জীবনে যারা এসেছিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তারা।

আনন্দলাল ভালো করে তাকায় মঞ্জরীর দিকে।

একটু হালকা হবার চেষ্টা করে বলে,—গেরুয়াটা তবে আজই পরে আসব। চললুম।

আনন্দলাল বেরিয়ে যায়।

নীলকেশরের ঘরে এসে ধীরে ধীরে ওর ঘরে ঢোকে। ঘর নিস্তব্ধ।

নীলকেশর বসে আছে চুপ করে. আসনে।

বোধ হয় সান্ধ্য ভজনায় মগ্ন।

আনন্দলাল তানপুরাটা কোলে নিয়ে বসে।

নীলকেশর ধ্যানে ডুবে যাবার চেষ্টা করছে, একটু বিঘ্ন হলেই জপের দিকে মনকে নিবিষ্ট করে মনকে স্থির করবার চেষ্টা করছে। একটু একটু বিঘ্ন হয় আজকাল। মাঝে মাঝে একটা মুখ ভেসে ওঠে মনের আকাশে।

মধুর মায়ায় ভরা কালো চোখ দুটো পরিষ্কার দেখতে পায়। নীলকেশর বিরক্ত হয়। গোপীবল্লভের পাদপদ্ম স্মরণে আনবার চেষ্টা করে। ভাবে এ মায়া হয়তো বা গোপী-মায়া!

মুখখানি কিন্তু খুব চেনা। রূপমঞ্জরীর মুখ। নীলকেশর নিজের ওপরই নিজে বিরক্ত হয়। ভাবে হয়তো বা সেদিন রূপমঞ্জরী অমন আহত হয়ে চলে যাওয়ায় ওর মনের ওপর একটু রেখাপাত করেছে। কিন্তু করা

উচিত নয়। স্ত্রীলোকের কান্নায় মন ভুলতে দেওয়া কখনই উচিত নয়। কাঁদা হাসা ওদের স্বভাব। ওইটে সম্বল করেই অনেক সময় ছাই করে দেয় বড় বড় সাধকের তপস্যা।

তপোভঙ্গের এমন অস্ত্র আর নেই।

নীলকেশর কঠিন হবার চেষ্টা করে। কঠিন তাকে হতেই হবে। নির্বেদ আসে ক্রমশ মনে।

ধীরে ধীরে মনকে বশে আনতে পারে ও।

ধ্যানে ডুবে যায় ক্রমে।

নিশ্চল পাথরের মতো নীলকেশরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয় আনন্দলাল।

কি শীতল স্নিগ্ধ স্নায়ু! একটু নড়ছেও না। আশ্চর্য!

আর আনন্দলাল চুপ করে বসে থেকেও হাঁটুটা নাচাচ্ছে। নয়তো তানপুরোটায় হাত বোলাচ্ছে।

নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হয় আনন্দলাল।

বসে থাকে চুপ করে।

বাতাস নেই আজ। দরজার বাইরে তাকায় আনন্দলাল।

অন্ধকার প্রান্তর। মাঝে মাঝে ক্ষেত। কামরাঙা গাছের ছায়া চোখে পড়ে।

নিস্তব্ধ প্রান্তরে একটু বাতাস একটু শব্দ নেই।

আকাশে তারা দেখা যায় না। একটু মেঘ করেছে বোধ হয়।

আনন্দলাল একটু একটু কাসে।

রুমালটা বার করে মুখ মোছে। জল তেষ্টা পেয়েছে ওর।

আরও সময় কাটে। নীলকেশর নিচু হয় এবার। মাটির ওপর নিচু হয়ে প্রণাম করে। আবার বসে স্থির হয়ে।

এবার চোখের পাতাদুটো মেলে একটু একটু করে।

তখনও বাইরের পরিবেশে মনটা আসে নি সম্পূর্ণ।

উঠে দাঁড়ায়। আসনটা পাতা থাকে।

ফিরে তাকিয়ে একটু হাসে।

আশ্চর্য, একটু চমকায় না কিন্তু!

—কখন এলেন?

—এই কিছুক্ষণ। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। জল আছে।

নীলকেশর শান্তস্বরে বলে,—জল তোলা হয় নি আজ। একটু বসুন আপনি।

কলসীটা নিয়ে বেরিয়ে যায় নীলকেশর।

আনন্দলাল কিছু বলে না।

খানিকক্ষণ পর ঘাট থেকে জল নিয়ে আসে নীলকেশর। মাটির ভাঁড়ে নিজে হাতে জল ভরে দেয় আনন্দলালকে।

আনন্দলাল জলটা খেয়ে বলে,—বাঁচালেন।

নীলকেশর বসে।

বলে আনন্দলাল,—আপনাদের এখানে জল খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। শশিনাথের বাড়িতে ওরা হয়তো বা বিরক্ত হয়। বিরক্ত হয়ই বা বলি কেন, সেবা করতে পেলে ওরা আনন্দ পায়। আশ্চর্য বৈষ্ণবদের মনের ভাব।

নীলকেশর হাসে।

—বিশেষ করে রূপমঞ্জরীর—বলে আনন্দলাল।

নীলকেশর একটু নড়ে ওঠে।

—মঞ্জরীর সেবা কোনদিন ভুলব না। জলটি দেবে, তাও কত যত্ন করে দেয়। মেয়েটা বড় ভালো। অনেক দেশ ঘুরেছি সাধুভাই, এমন মেয়ে আমার চোখে পড়ে নি।

নীলকেশর হঠাৎ জবাব দিতে পারে না।

নীলকেশরেরও চোখে পড়ে নি, কিন্তু একেও চোখে না পড়লে বোধ হয় আরও ভালো হত।

আনন্দলাল তানপুরোয় টংকার দেয়।

নীলকেশরের কাছে এসে ও অনেক কথা বলে ফেলে, বলতে ভালো লাগে।

বলে—ওদের জন্যেই দিনকতক রয়ে গেলাম, নইলে এতদিন কলকাতায় চলে যাবার কথা। বিশেষ করে ওই রূপমঞ্জরী। মেয়েটি আপনার কেমন মনে হয়?—টুং টুং করে তানপুরায় টংকার দেয় আনন্দলাল।

নীলকেশর ভাবে একটু।

রূপমঞ্জরীর সেদিনকার রূপটা ভোলে নি নীলকেশর। কিছুতেই যেন ভুলতে পাচ্ছে না। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আসে নি। আর হয়তো আসবে না। না এলেই তো ভালো। তবু মাঝে মাঝে ভালো লাগছে না কেন?

মেজেতে ময়লা জমছে। জল তোলা হয় না। কম্বলটা কয়েকদিন কাচা হয় নি।

তা হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। গাছতলায় থাকা অভ্যেস আছে। কিন্তু তবু কেন যে মনটার কোথায় একটু ফাঁক দেখতে পায় নীলকেশর।

—মেয়েটা ভালো নয়?

নীলকেশর শান্তস্বরেই বলে,—হ্যাঁ, ভালো।

—শশিনাথও চমৎকার লোক। ওরাই তো বাঁচাল এবার!

নীলকেশর চুপ।

—মঞ্জরী আপনার কথা খুব বলে,—তানপুরোয় আঙুল বোলাতে বোলাতে বলে ও।

নির্বিকার হবার চেষ্টা করে নীলকেশর,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আপনাকে মহারাজ বলে।

আরও নির্বিকার হবার চেষ্টা করে নীলকেশর। কিন্তু পারছে কি?

—আজই বলছিল—।

কী বলছিল শুনতে একটু ইচ্ছে হয় না তা নয় তবু নীলকেশর নিজেকে সংযত করে।

—বলছিল এখানে আর আসতে সময় পায় না। কেন? আগে বুঝি খুব আসত?

নীলকেশর শান্ত জবাব দেয়,—তা আসত।

আনন্দলাল রূপমঞ্জরীকে নিয়ে আলাপ করতে পেয়ে খুব আনন্দ পায়। ওকে নিয়ে আলোচনা করতেও ভালো লাগে। আনন্দলালের চরিত্রে এত বেশী ভালো লাগা এই প্রথম।

নীলকেশরের কিন্তু ভালো লাগছে না।

রূপমঞ্জরীকে নিয়ে আনন্দলালের এত উৎসাহ কিছুতেই যেন ভালো লাগছে না।

ও বলে,—একটা গান হোক না!

আনন্দলাল তানপুরো ওঠায়,—শশিনাথ এখনও এল না!

—আসবে। আপনি গান ধরুন।

—আজ আর গান ভালো লাগছে না। আপনি বোধ হয় এখানে বরাবর থাকবেন না?

—না।

—কতদিন আছেন?

—এই তো কিছুদিন। দিনকাল মনে করে রাখি না।

—কেন?—হাসে আনন্দলাল।

—ওটাও তো হিসেব, তা ছাড়া—চুপ করে নীলকেশর।

—তা ছাড়া কি— জিজ্ঞেস না করে পারে না আনন্দলাল।

—তা ছাড়া গা এলিয়ে যে দিয়েছে তার হিসেবের কি দরকার?

—গা এলিয়ে দেওয়াটা কিন্তু আলস্যও হতে পারে।

নীলকেশর গম্ভীর স্বরে বলে,—না। গা এলিয়ে দেবার চেষ্টা করাটাও কাজ। তাছাড়া কাজ কি শুধু বাইরে দেখে বিচার করা যায়?

আনন্দলাল চুপ করে থাকে।

নীলকেশর বলে,—আসল কাজ তো মনে, মনের সংকল্প ছাড়া তো একটা আঙুলও নাড়তে পারেন না আপনি।

কথাটা ভেবে দেখতে হয়

আনন্দলাল স্বীকার করে,—তা ঠিক।

নীলকেশর হাসে,—আমাদের উলটো। সংসারের কোন সংকল্প না করার কাজ। একটা মাত্র সংকল্প থাকে।

—সেটা কি ?

—সেটা বাহ্য নয়।—হাসে নীলকেশর।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে আনন্দলাল।

নীলকেশরের কথাগুলোর ভেতর এক স্থির বিশ্বাসের আভাস পায়।

—কিন্তু সমাজের তো কোন কাজে আসে না এরা ?—অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করে আনন্দলাল।

নীলকেশর আবার হাসে,—বলে,—আমার কথা বলছি না। কিন্তু বড় বড় মহাপুরুষ যাঁরা তাঁরা সমাজের সবচেয়ে বেশী কাজ করেন।

—কেমন করে ?

—তাঁরা প্রার্থনা করেন সকলের ভালো হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যাঁরা তাঁদের কাছে আসেন, তাঁদেরও সেই উপদেশ দেন। কি জানেন, এঁরা না থাকলে সংসারটা কিছুদিনের ভেতরই এক হিংসা বিদ্বেষ লোভের নরক হয়ে পড়ত।

কথাগুলো স্থির বিশ্বাসে ভরা।

আনন্দলাল চট করে জবাব দিতে পারে না আর।

কেবলি মনে হয়, এত তলিয়ে তো ভাবি নি কোনদিন।

অনেকক্ষণ কেটে যায়, রাত হয়ে আসে। শশিনাথ আসে এতক্ষণে। আনন্দলাল তানপুরোটা নিয়ে একটু গুন গুন করছিল আর ভাবছিল।

শশিনাথকে দেখে বলে,—কি, এতক্ষণে ?

শশিনাথ লজ্জিত হয়ে বলে,—আঁজ্ঞে, একটু কাজ পড়েছিল দোকানে।

নীলকেশরকে প্রণাম করে শশিনাথ। নীলকেশর হাতজোড় করে থাকে।

শশিনাথ চুপ করে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে সকলের।

হঠাৎ আনন্দলাল বলে,—সামনের সপ্তায় চলে যাব ভাবছি।

শশিনাথ তাকায়।

নীলকেশর বলে,—কেন, ভালো লেগেছে জায়গাটা, আর দিনকতক থেকেই যান।

আনন্দলাল টুং টুং করে শব্দ করে তানপুরায়।

শশিনাথ বলে,—আর মাসখানেক থাকুন।

আনন্দলাল হাসে,—ক্ষেপেছ? রোজগার বন্ধ, কাজ বন্ধ, তোমার ঘাড়ে বসে কতদিন খাব আর?

শশিনাথ হাসে,—কাই বা খান? এক ছটাক চালের ভাতও খান না দুবেলায়। তবু বুঝতুম যদি খুব খেতে পারতেন।

আনন্দলাল হাসে।

নীলকেশরকে জিজ্ঞেস করে—আপনি কতদিন আছেন?

—যতদিন না আমার কাজ শেষ হয়।

—তার মানে?

শশিনাথ বুঝিয়ে দেয়,—মানে যতদিন না ওঁর গুরুকৃপা লাভ হচ্ছে, ততদিন যাবেন না। এখানে শ্রীগুরুর ভিটেয় সাধন করতে এসেছেন তো?

আনন্দলাল তাকিয়ে থাকে।

নীলকেশর মৃদু মৃদু হাসছে।

আনন্দলাল আর কথা খুঁজে পায় না।

বলে,—চল শশী। আজ বাড়ি যাওয়া যাক।

নীলকেশর বলে,—এখনই চললেন? গান আর হবে না?

—না, আজ ভালো লাগছে না। কাল হবে।

শশিনাথ নীলকেশরকে বলে,—মানে মেজাজ নেই। মেজাজ ছাড়া কি গান হয়?

নীলকেশর হাসে। উঠে দাঁড়ায়।

ওরা বেরোয় ঘর থেকে।

অন্ধকার রাস্তায় পাশাপাশি চলে শশিনাথ আর আনন্দলাল। বাইরে বাতাস নেই। গুমট গরম। আকাশটা তেমনি কালো

কলাবাগান পেরোয় ওরা।

খুব আস্তে আস্তে চলে।

শশিনাথ বলে,—শুধু দোকানের কাজেই দেরি হয় নি। আজ একটা ব্যাপার হল।

—কী?

—আপনার কাছে পরামর্শ চাইব ভাবছি। কী করব বুঝতে পারছি না।

—ব্যাপারটা কি বল না।

শশিনাথ আস্তে আস্তে বলে,—মঞ্জরীর একটা সম্বন্ধ এসেছিল, পাত্র ভালোই। পয়সাকড়িও আছে। এই আমাদের গাঁয়ের ছ-সাত কোশ দূরে থাকে ওরা। সবই ভালো, কিন্তু প্রথম পক্ষের ছোট ছোট দুটি মেয়ে আছে, বয়সটাও একটু বেশী। অবিশ্যি মঞ্জরীর বয়সও খুব কম নয়। তবু—

আনন্দলাল চুপ করে চলে।

শশিনাথ বলে,—কী করি বুঝতে পারছি না। আপনি কি মনে করেন?

আনন্দলালের মুখটা অন্ধকারে দেখা যায় না।

গলাটা একটু যেন নিচু আর ক্লান্ত। বলে,—আমি আর কী বলব। ভালো বুঝলে করবে। তবে একটু দেখেশুনে বিয়ে দেওয়াই ভালো। দুটি মেয়ে সঙ্গে বর যদি বিয়ে করতে আসে, সেটা কি ভালো দেখাবে?

—তাই তো ভাবছি।

ওরা বাইরের ঘরে এসে পড়ে। দুজনেই ঘরে ঢোকে।

আনন্দলাল দেখে বিছানাটি পরিপাটি করে পাতা, পাশে এক গেলাস জল ঢাকা।

বুঝতে দেরি হয় না এ কার কাজ।

শশিনাথ আপন মনেই বলে,—বিয়েও দিতে পারছি না। টাকার জোরও নেই। বোনটাকে দেখে মাঝে মাঝে সত্যি বড় কষ্ট হয় মাস্টার মশাই। এমন ভালো মেয়ে, তার বরাত এমন! এর চেয়ে ভালো পাত্রই বা পাব কোথায়? বামুনের ঘরের মেয়ে তো! অনেক টাকা চেয়ে বসে।

আনন্দলাল বিছানার ওপর বসে চুপ করে থাকে।

—আপনি বলছেন এ বিয়ে ভালো হবে না?

আনন্দলাল গভীর ভাবে কী যেন চিন্তা করছে। ওর কথাটাও ভালো করে কানে যায় না।

বলে,—কী বললে?

—ভাবছি ওদের কী বলব। মত দিয়ে দেব কিনা।

—তোমার স্ত্রীকে দিয়ে মঞ্জরীর মতটা নাও।

—তা বটে!—এতক্ষণে একটা বুদ্ধি খুঁজে পায় শশিনাথ,—ঠিক বলেছেন।

দুজনেই আবার চুপ করে বসে থাকে।

একটু পরে মঞ্জরী আসে ঘরে।

—খেতে এস দাদা।

—যাই। চলুন খেতে ডাকছে।

শশিনাথ ওঠে। আনন্দলাল কোন কথা বলে না। ধীরে ধীরে উঠে ওর পিছন পিছন রান্নাঘরের দিকে যায়।

খাওয়া সেরে শুতে আসে আনন্দলাল। একটা সিগারেট ধরায়। পরিপাটি করে পাতা বিছানার ওপর বসে। এক গেলাস জল তেমনি ঢাকা পড়ে আছে। পাশে একটি রেকাবিতে ঢাকা পান দুটো। পানদুটো তুলে নেয় ও। মেয়েদের কাছ এমন সেবা জীবনে ও পায় নি। দিন দিন ও মুগ্ধ হয়েছে, অবাক হয়েছে। ওর ভালো লেগেছে। শেষটায় ওর এত বেশী ভালো লেগেছে যে এখান থেকে চলে যাবার কথায়ও ওর মনটা যেন ভালো লাগে না।

উমার কথা মনে হয়। উমা ভালোবাসত কিনা ঠিক বোঝা গেল না জীবনে, তবে রূপমঞ্জরীর মতো করে ও উমাকে পেল না কেন?

ওর নিজের দোষ আছে ঠিকই। ও মদ খেয়েছে, জুয়া খেলেছে, অনেক অবিচার করেছে উমার ওপর। উমা কেন ওকে এমন করে বশ করতে পারল না। তবে হয়তো সে আজকের মতোই মদ জুয়া সবই ছেড়ে দিত! এটা কি উমার দোষ নয়?

হয়তো বা দোষ নয়। উমা যে সমাজে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কদর বেশী। নিজের হিসেব ষোল আনা বুঝে নিয়ে পরকে যদি কিছু পার দাও। নিজের পাওনা একটু কম পড়লে সেখানে দিনে দিনে অশান্তি বেড়ে চলে, নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেওয়ার মতো পাগলামি ওদের কাছে আর কিছুই নেই, হয়তো নিজেকে নিঃশেষ করে ভালোবাসার মতো ক্ষমতাও নেই।

এখানে কিন্তু উলটো। উমার সমাজ আর রূপমঞ্জরীর সমাজ বিপরীত-মুখী। স্নেহ ভালবাসা সেবা এগুলোর ভিতরেও ওদের নিজের পাওনার বোধটা লুকিয়ে থাকে পুরোপুরি, সেখানে ঘা পড়বার জো নেই।

আর এরা? এরা উমার কাছে হয়তো বা নিরেট বোকা। সব বিলিয়ে দেয়া, প্রাণ ঢেলে ভালোবাসা, মন ভরে সেবা করা—এ সব তো রীতিমত বোকামি।

কিন্তু সংসারে বোকাগুলোরই প্রাণপ্রাচুর্য বেশী। কথাটা আনন্দলাল মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। রূপমঞ্জরী যখন ভালোবাসবে, নিজের বলে আর কিছু রাখবে না। সব ঢেলে দেবে। ওর দেহ মন যৌবন উজাড় করে দেবে। তাতে পরের কাছে ঠকলেও নিজেকে নিজে ঠকায় না, নিজের অন্তরের সত্যকে বেগময় করে তোলে আরও, নিজের কাছেই নিজে অনেক উঁচুতে উঠে যায়।

অন্তরের আবেগের হিসেব করার মতো পাপ বোধ হয় সংসারে আর নেই। ওখানে বেহিসেবীরাই জীবন-ভোগে জিতে যায়।

আনন্দলাল আর একটা সিগারেট ধরায়। নিস্তব্ধ হয়ে আসছে সমস্ত গ্রামখানি। নিশ্চুপ নিথর। একটু একটু বাতাস বইছে। কুয়োর ধারে পেঁপে গাছের বড় বড় পাতাগুলো পড়ছে। আকাশের দিকে তাকায়। অসংখ্য কুঁচি কুঁচি তারায় ভরা আকাশ, ঝিকমিক করছে। আনন্দলাল চোখদুটো বোজে।

রূপমঞ্জরীর বিয়ে হবে অন্য কারো সঙ্গে ভাবতে তার মোটেই ভালো লাগছে না। কেন? সে কি ভালোবেসেছে?

এতদিন মেয়েরা তাকে ভালোবেসে এসেছে। তার অনুরাগের একটু ছোঁয়াও পায় নি। রূপমঞ্জরী প্রথম মেয়ে যে তাকে এত বেশী আকর্ষণ করতে পারছে। ভাবলে অবাক লাগে বই কি! আনন্দলালের জীবনে মেয়েকে ভালোবাসা! বছর খানেক আগে নিজেই বিশ্বাস করতে পারত না ও।

দ্বিতীয় পক্ষে যদি রূপমঞ্জরীর বিয়ে দিতে বাধা না থাকে, তবে সেও তো বিয়ে করতে পারে! বিয়ে করে রূপমঞ্জরীকে নিয়ে এখানেই ঘর বাঁধবে। কলকাতায় আর যাবে না।

অন্তরে এক তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মেছে শহরের ওপর। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় রাস্তায় আলো-ঝলমল ফুটপাথে শাড়ির রঙের বাহার। বাঙালী সায়েব আর রঙ-মাখা মেয়ে দেখলে মনে হয় সমস্ত শহরটাই যেন কড়া মদে মাতাল হয়ে আছে।

এখানে সন্ধ্যায় ছড়ানো সবুজ। পাখিগুলোর বাসায় ফেরার আয়োজন, ডাকাডাকি। নাকে রসকলি আঁকা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা দু-চারটি মেয়ে, কাঁধে গামছা, কাঁখে কলসী। দেখতে দেখতে স্নায়ু যেন শীতল আমেজে ভরে যায়।

বলবে একবার শশীকে? অথবা রূপমঞ্জরীকে?

সিগারেটটা বার বার টানতে থাকে আনন্দলাল। শেষ হয়ে এলে টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দেয় দরজার বাইরে। বসে বসে ভাবতে থাকে ও।

১৬

পরদিন সন্ধ্যায় বসে ভাবছিল নীলকেশর। কেন তার এমন হল? মনের এ কি ফাঁকি?

একটু ফাঁক পেলেই, এসে পূর্ণ করে দেয় এক নারী-চিন্তা।

রূপমঞ্জরীর আকর্ষণ—একি যোগমায়ার আকর্ষণ?

কিছুতেই কাটতে চাইছে না।

কৃষ্ণচিন্তায় যখন ভরে থাকে মন, তখন বোঝা যায় না। মন হয়তো বা তখন অবসর খোঁজে। একটু অবসর পেলেই রূপমঞ্জরী এসে দাঁড়ায়।

বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকায়। সবুজ শাড়ির আঁচলে বাঁধে প্রসাদী বাতাসা, তার দিকে তাকায় ফিরে, চোখের ভাষা পড়তে পারা যায়। চোখদুটো অভিমানে ভারি হয়ে নেমে আসে। ঘনপল্লব ভিজে ওঠে।

নীলকেশর চমকে ওঠে। একি ভাবছে সে!

মন একটু হাসে।

আবার গুরুচিন্তায় মন দেবার চেষ্টা করে নীলকেশর।

আজন্ম ব্রহ্মচারী নীলকেশর। বৈরাগী নীলকেশর।

বিষয়ে বিরাগ তো হল না। বিষয় তাকে আকর্ষণ করছে আলোর পোকার মতো।

নীলকেশর মিথ্যেই বৈরাগ্যের ভেক গিয়েছে।

তবে কি এ জন্মে হবে না।

আরও ভোগ ঠাকুর? আরও ভোগ?

ভিজে ওঠে ওর মন।

আর চাই না। আর কিছু চাই না। কৃষ্ণ নীলপদ্মের ভ্রমর হবার স্বপ্ন সফল কর।

আর কিছু চাই না।

নীলকেশর নিজে শান্ত হবার চেষ্টা করে।

ঘরে ঢোকে আনন্দলাল।

আজ আর হাসে না। বিরস মুখে বসে তানপুরাটা কোলে নিয়ে।

নীলকেশরও হাসে না।

শুধু আহ্বান করে,—আসুন। বসুন।

আনন্দলাল বসে।

কেউই কথা বলছে না।

সময় কাটতে থাকে।

নীলকেশর মনে মনে জপ করতে থাকে।

দিনরাত্রি জপ করা ছাড়া উপায় নেই আর। মনকে একাগ্র করতে হলে ওই পথ। তারপর যা হয় হবে।

এখানে এ পরীক্ষায় তাকে জিততেই হবে।

চিত্তশুদ্ধি এখনও হয় নি। নির্মল হয় নি মন। এমন করে থাকা চলবে না। চিত্তশুদ্ধি হবে নামে। আর অন্য কাজ নয়। শুধু নাম জপ—নাম সংকীর্তন।

নীলকেশরের কপাল ঘেমে ওঠে।

আনন্দলাল তানপুরায় শব্দ করছিল টুং টুং।

আরও সময় কাটে।

আনন্দ হঠাৎ একসময় মুখ তোলে।

—একটা কথা বলছিলাম সাধুভাই।

ওর গলাটা একটু কাঁপে। ভেতরের উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায় গলায়।

নীলকেশর শান্ত স্বরে বলে,—বলুন।

—কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

নীলকেশর জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

আনন্দলাল তানপুরায় টংকার দেয়।

চুপ করে থাকে একটু সময়।

গলাটা একটু চেপে বলে, রূপমঞ্জরীকে তো আপনার ভালোই মনে হয়।

নীলকেশরের চোখ দুটো একটু বড় হয়। তাকায়।

—ওকে বিয়ে করতে চাই।

তানপুরার সব কটা তার এক সঙ্গে বেজে উঠলে যেমন হয়, নীলকেশরের স্নায়ুগুলো সব যেন তেমনি ঝংকার দিয়ে উঠল। আপনাআপনি। কিছুতেই শান্ত থাকতে পারছে না নীলকেশর।

একটা কথাও না বলে গুরুপাদপদ্ম মনে আনবার চেষ্টা করে।

আনন্দলাল মুখটা নিচু করেই বলে,—মনে হয় ও হয়তো আমার

জীবনে শান্তি আনতে পারবে। আমি একটু ঠাণ্ডা হতে চাই সাধুভাই। জীবনে অনেক জ্বলে জ্বলে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আর পারি না।

নীলকেশর খুব আস্তে আস্তে বলে,

—রূপমঞ্জরীকে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই ভালো হবে।

আনন্দলাল মুখ তোলে,—তাহলে আজই শশিনাথকে বলি?

নীলকেশর কোনমতে নিজেকে সংযত করতে পেরেছে। বলে,—বলুন।

—আপনার সামনেই না হয় বলি।

নীলকেশর চুপ করে থাকে।

—না হয় একা একা রাস্তায় বলব।

আনন্দলাল চুপ করে।

আবার চুপচাপ।

আজও বাতাস নেই। গাছের পাতা নড়ছে না। একটা শুকনো পাতার শব্দও পায় না ওরা।

বসে বসে ঘামতে থাকে দুজন।

নীলকেশর নামে মগ্ন হবার চেষ্টা করে। প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আনন্দলাল চুপ করে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পর আপন মনেই সুর আনবার চেষ্টা করে গলায়।

না, জমছে না। ভালো লাগছে না।

একটু পরে শশিনাথ এসে ঢোকে ঘরে।

আনন্দলাল গান ধরে। যেন ওকে দেখেই গান ধরে। কেন নিজেই জানে না।

আনন্দলালের স্নায়ুগুলো ধীরে ধীরে মেজাজে ওঠে।

সুর ধরেছে বসন্ত বাহার।

ফাল্গুনের সন্ধ্যায় সুর যেন ঢেউ তোলে—এক অপরূপ খুশির তরঙ্গ।

শশিনাথের চোখ দুটো ভরে ওঠে খুশিতে।

নীলকেশরের মনের কিনারায় সুরের তরঙ্গ আঘাত করে।

বসন্ত বাহার।

রাগ বসন্তের সঙ্গে হালকা খুশির মেজাজ মিশেছে।

আনন্দলাল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শশিনাথ মাঝে মাঝে বলে,—আহা! আহা!

রঙ ধরিয়ে দেয় নীলকেশরেরও মনে।

অনেক সময় ধরে শোনে। ভালো লাগে।

শুধুই ভালো লাগা। নীলকেশরের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ পর তানপুরার গুঞ্জন থেমে যায়। চুপচাপ বসে থাকে সবাই। শশিনাথ সুরটি মনে রাখবার চেষ্টা করে। এমন কি আনন্দলালের গাইবার ঢঙও লক্ষ্য করে মনে রাখে।

আনন্দলাল তানপুরাটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ে,—উঠি আজ।

নীলকেশর হাতজোড় করে। প্রণাম জানায়।

শশিনাথও ওঠে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার রাস্তায় চলতে থাকে।

১৭

শশিনাথকে বলেছিল আনন্দলাল। বেশি কথা নয়। সেদিনই খাওয়া হয়ে যাবার পর শশিনাথকে ডেকেছিল বাইরের ঘরে বিছানার কাছে। বলেছিল,—কী ঠিক করলে?

—কিসের? শশিনাথের মনে তখন বসন্ত বাহারের আলাপের আবেশ রয়েছে।

—ওই মঞ্জরীর বিয়ের?

—ভেবে তো ঠিক করতে পারছি না কিছু! দেখি ওকে বলি।

আনন্দলাল সিগারেট ধরায়।

একটু চুপ করে থেকে বলে,—একটা কথা তোমায় বলব ভাবছিলাম।

শশিনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

—বলছিলাম কি এখানেই থেকে যেতে চাই।

শশিনাথ বলে,—বেশ তো, থাকুন না।

—না মানে সংসার পাততে চাই। তোমাদের এখানে দু-একটা বড় ঘরে গান শিখিয়ে যা পাব, তাতে বোধহয় চলে যাবে।

—তা ইস্টিশানের ওধারে তো অনেক বড় লোকের বাস। বলেন তো তাঁদের বলি।

—না এখন নয়। পরে বলবে। মানে বলছিলাম কি, মঞ্জরীর বিয়ে আমার সঙ্গে দিতে তোমাদের যদি অমত না থাকে।

শশিনাথ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কথাটা যেন ভালো করে বুঝতেই পারে না।

—সংসার করবার শখ হয়েছে শশী। হাসতে থাকে আনন্দলাল।

শশিনাথ এতক্ষণে কথাটা বুঝতে পারে।

কি বলবে ভেবে পায় না। তবু বলবার চেষ্টা করে,—মানে আমাদের এমন সৌভাগ্য কি হবে কখনও? মত অমতের মানে—এর আবার একটা ইয়ে কি। তোমার গিয়ে যেদিন বলেন—

আনন্দলাল ঠাণ্ডাস্বরে বলে,—একটা দিনক্ষণ দেখতে হবে তো।

—সামনের শুক্রবারই তো দিন আছে।

—বড্ড তাড়াতাড়ি। তা হোক। তিন দিন আছে আর। যা না করলে নয়, এমন ব্যবস্থা করা যাবে না?

—খু-উ-ব। এর আবার কথা কি?

—তবে এই কথাই রইল।

শশিনাথ এবার ওঠে। ওর মনটা নাচতে শুরু করছে। ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারছে না।

বাইরে এসে সরমাকে ডাকে,—বলি শুনছ?

—কি?

—শিগগির শোন।

—দাঁড়াও খেয়ে উঠি।—খেতে খেতে বলে সরমা।

সরমা খেয়ে উঠলে সরমাকে বলা হয়ে যায়। সরমা একগাল হেসে বলে,—এ আমি আগে জানতুম।

—তাই নাকি!

সরমা বলে,—এ নিয়ে ঠাকুরঝির সঙ্গে কথাও বলেছি।

খুব খানিকটা হেসে বলে শশী,—নাঃ! তোমার বুদ্ধি আছে। মঞ্জরী কি বললে?

—কি আর বলবে? খুব খুশী হয়, কিন্তু বাইরে বলে—কী যা-তা বলছ।

—ওটা বোধহয় লজ্জায় বলে। ছেলেবেলা থেকেই খুব লাজুক কিনা?

সরমা বলে,—সে যা হোক, কাল থেকে সব যোগাড় করতে শুরু কর।

শশিনাথ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

মনে মনে ঠিক করে খাঁহুদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে হবে। আনন্দলালের টাকাটা তাকে ফেরত দিতে হবে কাল। সিগারেট তো সে দোকান থেকেই দেয়। সিগারেটের দামটা নিতে বলেছিল আনন্দলাল। ও আর নেবে না।

রাতটা শশিনাথের ভালো করে ঘুমই হয় নি। সরমারও নয়।

পরদিন ভোরে উঠে আনন্দলাল হাতমুখ ধুয়ে এসে বসেছিল। ভাবছিল আর তিন দিন পরের কথা। গান গাইছিল গুনগুন করে।

মঞ্জরী ঘরে এল। রোজই আসে।

হাতে একটা রেকাবিতে একটু মিষ্টি, এক গেলাস জল। তারপর দিতে হবে চা।

মঞ্জরী ভোরে স্নান করে। আজও করেছে। সন্ধ্যা-বন্দনা সেরে এসেছে।

ওর ভিজে ভিজে চুল বেয়ে জল ঝরছে তখনও দু-চার ফোঁটা।

আনন্দলাল ওর দিকে তাকায়।

আজকের দৃষ্টিটা যেন সম্পূর্ণ অন্য রকম।

এ চাউনির মানে বুঝতে মেয়েদের একটুও দেরি হয় না।

মঞ্জরী ওর লোভভরা চাউনি দেখে অবাক হয়।

ভালো লাগে না ওর।

তবু একটু হেসে বলে,—নিন, জলটা খেয়ে নিন।

আনন্দলাল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

অন্য দিন হলে মঞ্জরীর চোখে চোখ পড়লে আনন্দলাল একটু সংযত হত।

আজ এক স্পষ্ট ইঙ্গিত ধরা পড়ে ওর চোখে।

মঞ্জরীর গাটা কেমন করে ওঠে। ও চলে যেতে পারলে বাঁচে।

গেলাস আর রেকাবিটা সামনে রেখে বেরোতে যায়।

আনন্দলাল চট করে ওর একটা হাত ধরে বলে,—শোন, কথা আছে।

মুহূর্তে সব শরীর কেঁপে ওঠে মঞ্জরীর।

—ছিঃ! —বলে হাতটা টেনে ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে মঞ্জরী।

সোজা নিজের ঘরে চলে আসে।

তখনও বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে ওর। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে।

হাত-পা কাঁপে, অবশ লাগে।

বসে পড়ে মঞ্জরী।

চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

ব্যাপারটা ও কিছুই বুঝতে পারে না। কেন আনন্দলাল এমন ছেলে-মানুষের মতো ব্যবহার করল। কেনই বা বলল কথা আছে।

অনেকক্ষণ ভেবেও কোন কূল-কিনারা পায় না মঞ্জরী।

সরমা চা করে গামলায় চাল ধুচ্ছিল।

মঞ্জরীকে দেখেই বলে,—যাও চা-টা দিয়ে এস।

মঞ্জরী বলে,—আমি পারছি না আর। তুমি যাও।

সরমা খিলখিল করে হেসে ওঠে,—এত লজ্জা কি আর তিনদিন পর থাকবে!

—মানে ?

—মানে আর কি ! তখন সেই হবে আপন, আমরা হব পর। থাক বাপু এ দুটো তিনটে দিন তুমি ওর কাছে নাই গেলে। এদিককার কাজও তো কম নয়। কেনাকাটা কিছু কিছু করতে হবে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সরমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মঞ্জরী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

মুখটা ওর দক্ষিণের আকাশের ওই টুকরো মেঘটির মতো পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

১৮

এ জন্মটা বুঝি বৃথাই গেল ! কিছুতেই কিছু হল না আর ! আক্ষেপে ম্লান হয়ে ওঠে নীলকেশরের মন।

কিছুতেই মনকে ও স্থির করতে পারছে না। জপে ধ্যানে মগ্ন থাকবার চেষ্টার ত্রুটি নেই। তবু নির্বেদ আসে না যেন। বাসনার বহ্নিকণা জ্বালায় মনের গোপন গহ্বর। সে গহ্বরের পুরো মাপটা ঠিক করতে পারে না। কোথায় তার ফাঁক ! কেন তার জ্বালা !

একটা কথা মনে হয় ওর। বোধহয় কোন অপরাধ হয়ে গেছে কোথাও। অপরাধ হয়েছে মঞ্জরীর কাছে। বড় বেদনা নিয়ে ফিরে গেছে রূপমঞ্জরী দিনের পর দিন। সেই কাঁটাগুলো তুলতে পারছে না নীলকেশর।

কিন্তু রূপমঞ্জরীকে আঘাত না দিয়ে তো উপায় ছিল না ? ছিল, মনই বলে, ছিল। তৃণাদপি নিচু হয়ে যদি হাতজোড় করে দাঁড়াত ওর কাছে। ও চলে যেত, নিজে ইচ্ছে করেই হয়তো চলে যেত। আঘাত করে তাড়িয়ে দেওয়া বৈষ্ণবের ধর্ম নয়। মনটা বলে ফিসফিস করে। —তুমি ব্রহ্মচারী—এই অহংকার তোমাকে বিচ্যুত করছে। মুছে ফেল এ অহংকার। অহংকারে বৈরাগ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

শিউরে ওঠে নীলকেশর! সত্য কি তাই? রূপমঞ্জরীর কাছে আত্মনিবেদন করলে কি ভালো হত। না। আজন্মের সাধনা ধুয়ে যেত বন্যায়। ভালোই করেছে সে।

চুপ করে বসে থাকে নীলকেশর। জপে মগ্ন হবার চেষ্টা করে।

তখন বিকেল হয়ে আসছে। গাছগুলোর ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে পুবমুখো।

নীলকেশর বসে থাকে।

কে যেন আসছে! এদিকেই আসছে।

নীলকেশরের চোখ পড়ে। আসছে রূপমঞ্জরী।

মুহূর্তে নজরে পড়ে রূপমঞ্জরীর বিশুষ্ক মুখে গভীর বিপদের স্পষ্ট ছায়া।

চোখ দুটো কিছুটা বা হতাশ। গামছাখানা কাঁধে ফেলে কলসী নিয়ে চলেছে।

চোখে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয় নীলকেশর।

রূপমঞ্জরী ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কুটিরের পাশ দিয়ে চলে যায় ঘাটের দিকে।

অন্য দিন এ রাস্তা দিয়ে যায় না রূপমঞ্জরী। একটু ঘুরে যেতে হত পশ্চিমের পচা পুকুরে বনের ধারের সরু রাস্তাটা ধরে। ও রাস্তাটায় সাপ-খোপের ভয় আছে একটু। সজারু আর খাটাস আছে জঙ্গলের ভেতর। তবু মঞ্জরী ওই রাস্তা দিয়েই যেত। গোসাইয়ের ভিটের পাশ দিয়ে যেত না।

আজ কিন্তু ইচ্ছে করেই এ রাস্তা দিয়ে এসেছে।

কি জানি কেন মনে হল ওর নীলকেশরকে একটু না দেখে থাকতে পারছে না আর।

আনন্দলালের শেষ আলাপ তাকে বড় ঘা দিয়েছে।

নীলকেশরের ঘা সওয়া যায়। তাতে অভিমানের অধিকারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেমন একটু আনন্দও পাওয়া যায়। কিন্তু আনন্দলালের সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক নয়। আনন্দলাল অতিথি! কর্তব্যের তাগিদে তার সেবা করেছে।

সেবায় আন্তরিকতা ওদের আসবেই। ওরা যে বৈষ্ণব!

সেই সহজ আন্তরিকতাকে আনন্দলাল যে এমন ঘোরালো করে তুলবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি ও।

বৌদি বলেছে মাঝে বিয়ের কথা।

ও ভেবেছে ওটা বৌদির তামাসা। তাছাড়া বয়স্থা ননদের ভাবনার ভার কোনমতে কারুর ঘাড়ে চাপাবার একটা হাস্যকর চেষ্টা।

আজ স্তম্ভিত হয়েছে ও।

বৌদির নিছক তামাসাগুলো যে এমন কঠিন ভাবে সত্য হয়ে উঠবে কে জানত একথা!

মঞ্জরী সমস্ত দিনটা ছটফট করেছে নিজের ঘরে।

একবার ঠাকুরঘরে গেছে

তবু শান্তি পায় নি।

তাই এসেছিল এই রাস্তায়—নীলকেশরকে দেখলে যদি ভালো লাগে। ওকে দেখলে যে মঞ্জরীর মন ভরে ওঠে সত্যি!

দেখল মঞ্জরী। বুকের ভেতরটা কাঁপছিল।

তবুও দেখল একটু সময়ের জন্যে।

নীলকেশর একটু যেন রোগা হয়েছে। একটু যেন ম্লান হয়েছে।

মনটা গলে যেতে থাকল মুহূর্তে।

নীলকেশর দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন ভয় পেয়েছে।

রূপমঞ্জরী পরমুহূর্তেই কঠিন হয়ে উঠল আবার।

মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল।

নীলকেশর দেখল চলে গেল মঞ্জরী। আবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। মঞ্জরী চলে গেছে। একবার ডাকলেও তো হত। ডেকে বললে হত। আনন্দলালের সঙ্গে ওর বিয়েতে সুখী হয়েছে নীলকেশর। সত্যিই কি সুখী হয়েছে?

কই! প্রাণ ভরে শুভ কামনা করতে পারছে কই? কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে। মঞ্জরীর কাছে ও যে অবিনয়ী অপরাধ করে ফেলেছে।

সেই বোধটাই ওকে এতখানি জ্বালিয়ে তুলেছে। পরিষ্কার হতে পারছে না ওর মন।

এখান থেকে এবার চলে যেতে হবে। আর নয়। আর থাকতে সাহসই হচ্ছে না মনে। যাবে একেবারে বৃন্দাবনে। গোঁসাইয়ের আশ্রমে। বলবে সব কথা। সাধনের কথা, তার বিঘ্নের কথা। গুরুকৃপায় সব সহজ হয়ে উঠবে আবার। গুরু ছাড়া এ সংশয় মুক্ত করতে আর কেউ পারবে না।

চলেই যাবে। আর দু-একদিনেও যদি মনকে শান্ত করতে না পারে, তবে যেতেই হবে।

রূপমঞ্জরীর ভয়ে পালিয়ে যেতে হবে? এত ভয়? আবার মন বেঁকে বসে। রূপমঞ্জরীর ডাগর ভাসাভাসা চোখ দুটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এত গভীর চোখ নীলকেশর আর দেখেছে বলে মনে হয় না। মন বিভোর হয়ে ওঠে মুহূর্তে। রূপমঞ্জরীর লাবণ্যভরা মুখের ছায়া পড়েছে মনে।

কিছুক্ষণ মনটা নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে থাকে রূপমঞ্জরীর রূপানুরাগে।

এই কি রূপানুরাগ?

চমকায় নীলকেশর।

এই বুঝি রূপানুরাগের রসাবেশ!

নিচু হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

১৬

পরদিন ভোর থেকে আনন্দলালের কাছে একবারও এল না মঞ্জরী। একবার দেখতেও পেল না রূপমঞ্জরীকে সমস্ত দিন। মঞ্জরী ভোরে উঠে স্নান সেরে ঢুকেছে ঠাকুরঘরে!

অনেক বেলা হয়ে গেছে।

সরমা এসে ডেকেছে,—কি গো ঠাকুরঝি, ঠাকুরঘরেই কি দিন কাটবে? ছেলেটাকে একটু খাইয়ে দাও।

নিঃশব্দে উঠেছে মঞ্জরী। একটা কথাও বলে নি।

সরমা মনে মনে হেসেছে। মুখে বললে—বাবা! এত লজ্জা! বিয়ে আমাদেরও একদিন হয়েছিল গো! তা বলে তোমার মতো হাত-পা গুটিয়ে মুখ বুজে বসে থাকি নি।

অনেক বেলায় ফিরেছে শশিনাথ।

ঘেমে কালো হয়ে এসেছে ঘরে।

—কই গো; হাত-পা ধোবার জল।

মঞ্জরী ঘরে ছিল। শুনেছে সব। কিন্তু বেরোয় নি।

অন্য দিন মঞ্জরী বেরোত।

শশিনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণ, গিয়েছিল টাকার যোগাড়ে। দোকানটা সকাল সকাল বন্ধ করে ঘুরেছে মহাজনদের বাড়ি, খাঁতুদের বাড়ি। যোগাড় বিশেষ কিছু করতে পারে নি।

আনন্দলালের টাকাটা দিয়ে দিয়েছে আজ সকালে।

আনন্দলাল আপত্তি করেছিল।

শশিনাথ বলেছিল,—না, এখন আর এ টাকাটা আমার কাছে রাখা উচিত নয়।

অগত্যা নিতে হয়েছে আনন্দলালকে।

মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেয়েছে শশিনাথ এক মহাজনের কাছে।

যা পাওয়া যায়। ভিক্ষেয় তো বেরোতেই হবে এখন।

—কই গো!—আর-একটা হাঁক দেয় শশিনাথ।

সরমা বেরোয়,—তোমার বোন কই? জলটাও দিতে পারে না?

শশিনাথ বলে,—ওকে আর এ ছুদিন খাটিয়ো না। চুপচাপ থাক ছুদিন।

সরমা আর কথা বলে না। কুয়ো থেকে হাতপা ধোবার জল তুলে দেয়।

শশিনাথ একটু জিরিয়ে স্নান করতে যায় ঘাটে।

ঘরে বসে বসে সব শোনে রূপমঞ্জরী। সামনে ওর একটুকরো কাগজ আর কলম দোয়াত। মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল।

মাথার তালুটা দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে ওর। এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো! নীলকেশরের কথা মনে হয় একবার। যাবে নীলকেশরের কাছে? না, দরকার নেই। তার বিরক্তি আর জ্বালা বাড়াবে না আর। গেলেও কোন লাভ নেই। সন্ন্যাসী নীলকেশর। এ বিপদে তাকে কিছুই করতে পারবে না। নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে তাকাবে। সহ্য করতে পারবে না রূপমঞ্জরী। ওর নির্লিপ্ত চাউনিটা সব চেয়ে বেশী লাগবে ওর। অনেক্ষণ বসে বসে ভাবে। অনেকক্ষণ।

ক্রমে বিকেল হয়ে আসে। আজ আর কোথাও বেরোয় না আনন্দলাল। সাধুভাইয়ের কাছে যেতেও ইচ্ছে হয় না। চুপ করে বসে থাকে। অস্থির প্রতীক্ষা ওর মনে। মঞ্জরী কখন একবার এ ঘরের দিকে আসবে? মঞ্জরীর ঘরে একবার গেলে হয়! যেতে কেমন একটু ভয় হয়। সকালের ভ্রূ বেঁকিয়ে—ছিঃ!—শব্দটি এখনও কানে বাজছে ওর। অধীর হয়েও বসে থাকতে হয় ওকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। বেরিয়ে গেছে শশিনাথ আবার। এ বেলা দোকানেও যায় নি। বেরিয়েছে টাকার চেষ্টায়। আনন্দলাল বসে আছে। মনটা মাঝে মাঝে নাড়া খায়। একটি মুখ ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। সে মুখ রূপমঞ্জরীর নয়। শ্রীমতী উমার।

মনে মনে নিজের ওপরই একটু বিরক্ত হয় আনন্দলাল। কিন্তু ওই ভ্রূ-কোঁচকানো মুখখানি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। উমাকেও একদিন সে বিয়ে করেছিল, কিন্তু এমন করে এমন পরিবেশে নয়। রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করতে হয়েছিল। কেমন এক আইনমাফিক যান্ত্রিক বিয়ে। দুটি যন্ত্রের পুতুল। যন্ত্রযান একটি মোটরে গেল। সই করতে হল। সাক্ষীদের সই হল। যন্ত্রের মতো চলে এল।

আজ মনে মনে টের পায় প্রাণের কত অভাব ছিল সে বিয়েতে। তবু কেন উমার কথা বার বার মনে পড়ছে আজ। জোর করে চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করে। পেরে ওঠে না। কতকগুলো কথা ওর বেশী করে মনে হয়। উমার ওপর একসময় যে অত্যাচারটা ও করেছিল, তার

প্রতিবাদ উমা কখনও করে নি, শেষের দিকে মদে আর জুয়ায় যখন আকণ্ঠ ডুবে গেল আনন্দলাল, তখন উমার মুখ খুলেছিল। যদি কখনও ভালো হতে পার, এস।

আজ আনন্দলাল সব ছেড়েছে। মদ জুয়া সব। কিন্তু উমা তো ছাড়াতে পারে নি।

রূপমঞ্জরী না থাকলে তার আজকের জীবন সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। হয়তো বাঁচতই না।

আনন্দলাল সিগারেট টানে বসে বসে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়। ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে আসে চারধার। দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসে কানে। শিয়ালের অকারণ কলরব।

সব কলরবই থেমে আসে ক্রমে। খুব আস্তে আস্তে ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। মঞ্জরী ঠাকুরঘরে ঢুকেছে বোঝা যায়।

একটু পরে কানে আসে মধুর স্বর। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

প্রথম দিনের কথা মনে হয় আনন্দলালের। মধুর নামকীর্তন। অন্তরের ভাবাবেগে স্ফুরণ হচ্ছে যেন। এত করুণাঘন অকুণ্ঠ আবেগ! নেশার মতো লাগে আনন্দলালের।

আবার শোনে: এই ছয় গোঁসাই মোর করুণার সিন্ধু। ইহকাল পরকাল দুই কালের বন্ধু॥ এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলেন বাস। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ॥

চুপ করে শোনে আনন্দলাল। প্রথম দিনের মতো নতুন করে ভালো লাগছে আজ নামকীর্তন। চোখ দুটো ওর আধবোজা হয়ে আসে আপনা-আপনি।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার জমাট হয়ে আসে ক্রমে, আনন্দলাল তেমনি বসে আছে। সরমা একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে যায় বাইরের ঘরে।

আনন্দলাল চমকে তাকায়। ও ভেবেছিল রূপমঞ্জরী।

বড় তৃষ্ণা পেয়েছে আনন্দলালের। গলাটা শুকিয়ে এসেছে। সন্ধ্যার সময়টা এখনও ওর এমন হয়।

আনন্দলাল একটু নড়ে বসে, বলে সরমাকে,—এক গেলাস জল পাঠিয়ে দেবেন তো ?

পাঠিয়ে দেবেন তো মানে রূপমঞ্জরীর হাতে পাঠিয়ে দিতে হবে এটা না বললেও বোঝা যায়। সরমা কথার উত্তর না দিয়েই চলে যায়।

আবার তেমনি চুপ করে বসে আছে আনন্দলাল।

নামকীর্তন বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কই এখনও তো জল নিয়ে এল না মঞ্জরী ?

হারিকেনটা একটু কমিয়ে দেয় আনন্দলাল।

কে একজন ঘরে ঢোকে। চমকে তাকায় আনন্দলাল।

রূপমঞ্জরী ? হ্যাঁ রূপমঞ্জরী। ওর মুখটা ভালো করে দেখা যায় না।

আধা অন্ধকারে মুখটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করে আনন্দলাল।

ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রূপমঞ্জরী তবে এসেছে ?

রূপমঞ্জরী এগিয়ে এল। শাড়ির কোণে বাঁধা একটুকরো কাগজ বার করে মুখটা নিচু করে।

জল কই ?

জল মঞ্জরী আনে নি। এনেছে একটুকরো কাগজ।

আনন্দলালের সামনে কাগজটুকু ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আনন্দলাল ভাঁজ-করা কাগজটি কুড়িয়ে নেয়।

ভাঁজ খোলে।

লণ্ঠনের আলোর সামনে মেলে ধরে কাগজটি।

তাতে স্পষ্ট মেয়েলী হাতে লেখা :

> আপনি আমাকে বিবাহ করিলে নিশ্চয় মরিব
> জানিবেন। আপনি চলিয়া যান।

আর কিছু লেখা নেই।

স্তব্ধ হতবাক আনন্দলাল কাগজখানি মেলে ধরে চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

আপনি চলিয়া যান। আদেশ। এ আদেশ অমান্য করবার সাহস কই তার।

নিজের মনেই একটু হাসে আনন্দলাল।

হাসিতে বিস্ফারিত চোখদুটো যেন ওর জোলো' মনে হচ্ছে।

নিষ্ঠুর পুরুষ আনন্দলাল। কাঁদতে জানে না।

ধীরে ধীরে ওঠে।

জামাটা পরে। চটিটা পায়ে গলিয়ে নেয়।

ঘর থেকে বেরোয় অন্ধকার মাঠে।

আকাশে মেঘ করেছে। গুমট জমাট অন্ধকার।

অন্ধকারে উমার মুখখানা ভেসে ওঠে আনন্দলালের চোখের সামনে। উমার কাছে যে অপরাধ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে এখনও। উমার কাছেই যেতে হবে।

অন্ধকারে সোজা চলে। স্টেশনের রাস্তা ধরে আনন্দলাল।

২০

সমস্ত বাড়িখানা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বোবা হয়ে গেছে। আনন্দলাল যে চলে যেতে পারে, একথা ভাবতেও পারেনি কেউ। শশিনাথই প্রথম জানতে পারল।

আনন্দলালের ঘরের কাছে গিয়েছিল খুব ভোরে। কিছু পরামর্শ ছিল বিয়ের সম্বন্ধে।

ঘরের সামনে গিয়ে দেখে দোর খোলা।

ঘরে গিয়ে দেখে বিছানাটা পাতা রয়েছে। সুটকেশটাও রয়েছে পাশে। রেকাবিতে ঢাকা এক গেলাস জলও।

এত ভোরে কোথায় বেরোল আনন্দলাল? এত ভোরে তো কোনদিন ওঠেই না।

দু-চার টুকরো পোড়া সিগারেট পড়ে আছে এখানে-ওখানে।

কিছুক্ষণ বসে থাকে শশিনাথ।

বিছানার ওপর বসে। হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে। আসবে এখুনি।

কিছু জরুরী কথা রয়েছে। আনন্দলালের পক্ষ থেকে কত লোক আসবে, তার বন্ধুবান্ধব, কোনও স্বজন যদি কোথাও থাকে। তারা আসবে কিনা। সব সুদ্ধ কত লোক হবে। জানতে পারলে খুব সুবিধে হয় ওর। সেই অনুযায়ী টাকা জোগাড় করতে হবে তো! খাঁদুদের কাছ থেকে কিছু ধার নিতে হবে। আরও দু-চার জায়গায় টাকার জোগাড়ে বেরোতে হবে। সরমার বাবার কাছে গেলে কেমন হয়? না। দরকার নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা না নেয়াই ভালো।

গোঁসাইয়ের কৃপা হলে সব হয়ে যাবে। ভেবে আর কী হবে।

গোঁসাইয়ের পাদুকা স্মরণ করে শশিনাথ।

যখনই মনে ভয় আসে, কোন দুশ্চিন্তা আসে, বা বিপদ আসে, গোঁসাইয়ের পাদুকা স্মরণ করলেই যেন মন পরিষ্কার হয়ে যায়। আশ্চর্য কিছু নয়। চিরদিনই এমনি হয়ে আসছে। ওদের আনন্দ কখনও মরে না। নিরানন্দ কাকে বলে জানে না।

সংসারে নিরানন্দ হয়তো বা আসতে চায়, কিন্তু মনটাকে এলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। সব ভার আর একজনের ওপর দিয়ে নিরুদ্বেগ। গাধার মত বোঝা বইতে ওরা আসেনি। চিন্তার বোঝা কে বয়? কি বা প্রয়োজন?

তবু আজ একটু অস্থির হয়ে পড়ছে শশিনাথ।

এখনও তো আনন্দলাল এল না!

ঘর থেকে বেরুল শশিনাথ।

চৈত্রশেষের সকাল। বেরিয়ে বড় ভালো লাগে।

মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস লাগে চোখে মুখে। গাছের-পাতা-ধোয়া বাতাস।

কামরাঙা গাছের তলায় সূর্যের নরম আলোর ছড়াছড়ি।

ইএ তো গোঁসাইয়ের ভিটে। দোরের ঝাঁপটা খোলা।

সাধুভাই ঘরে নেই। বোধ হয় বেরিয়েছে ভোরে স্নানে।

বাঁ দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে যায় শশিনাথ। বাগান পেরিয়ে বিশাল ক্ষেতের সামনে এসে পড়ে। এই গাঁয়ের সীমানা। এর পর আরও অনেক ক্ষেত পেরিয়ে গিয়ে ওঠা যায় উলুপুরে। বেড়াতে এলে এদিকটাই তার আসবার কথা।

কিন্তু কই! দু-চার জন চাষী ছাড়া আর কোন জনমানব চোখে পড়ে না।

শশিনাথ গ্রামের সীমানা ঘুরে যখন বাড়ি আসে তখন সূর্য উঠে গেছে। রোদের তাপ বেড়েছে। কপালে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে।

আনন্দলালের ঘরে এসে দেখে যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনি সব পড়ে রয়েছে। আনন্দলাল নেই। রূপমঞ্জরী দাঁড়িয়ে ছিল দাওয়ায়।

ওর বিশুষ্ক মুখখানা নজরে পড়লেও শশিনাথ সে কথা না বলে, বলে,—মাস্টার মশাই কোথা গেছে জানিস? এসেছিল?

রূপমঞ্জরী তাকায়। চোখের পল্লবের নীচে নীল ছায়া। ঠোঁট দুটো পাণ্ডুর।

—দেখেছিস?

—না।

রূপমঞ্জরীর বেশী কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। ও ঘাটে যাবার উদ্যোগ করে।

শশিনাথ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলে না। রূপমঞ্জরীর মুখের গাম্ভীর্য একটু অস্বাভাবিক লাগে ওর।

—কোথায় যে গেল!—বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে এগোয়।

রূপমঞ্জরীর কানে আসে কোথায় যে গেল!—থমকে দাঁড়ায়। আনন্দলালের দোর খোলা। ঘরের দিকে নজর যায় আপনা আপনি।

কী ভেবে আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঘাটের দিকে এগোয়।

ভাবে, সত্যিই কি আনন্দলাল চলে গেল নাকি! চলে গেল!

কথাটা মনের ওপর নানা ভাব-তরঙ্গের বিস্তার করে।

মুক্তির স্বাদ। চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি।

চলে গেলে ওর জীবনকে নিয়ে আর টানাটানি করতে পাবে না কোন দিন। আর ভয়ের লেশমাত্র থাকবে না ওর। আনন্দলালকে জীবনের কোথাও আর স্থান দিতে হবে না ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

মঞ্জরীর মনের গভীর আনন্দে হালকা তরঙ্গ আনবার কেউ থাকবে না আর। বাঁচা গেল!

কিন্তু সত্যিই কি বাঁচা গেল!

সংসারে বাঁচা বড় কঠিন। কোথায় মনের কোণে একটা স্থানে আনন্দলাল একটা স্পষ্ট চিহ্ন রেখে গেছে। ওর ছন্নছাড়া স্বভাবটা ওর মনে উন্মেষ করেছে এক স্নেহ-শান্ত ভাব। এক দামাল দুষ্টু ছেলের জন্যে যেমন একটা ভাব আসে।

কিছুই খেয়াল থাকে না। কিছুর ওপর আকর্ষণ থাকে না অনেক সময়। এই তো আনন্দলালের স্বভাব। ওর এ স্বভাব যে রূপমঞ্জরীকে ভাবিয়ে তুলছে।

চলে গিয়ে আবার যদি অসুখে পড়ে। কে দেখবে?

মনটাকে ফেরাতে কষ্ট হয়। তবু ভাবতে হয়, কে আবার দেখবে! গোঁসাই দেখবেন। গোসাইয়ের সংসার গোসাই দেখবেন। তাঁর অত ভাবনা কিসের?

মিছে ভাবনা করে লাভ নেই।

রূপমঞ্জরী নিজেকে অনেকটা হালকা করে নেয়।

যাকে সে জীবনে কখনও আকাঙ্ক্ষা করেনি, তাকে ভাববার প্রয়োজন নেই। দ্বিচারিণী হতে হয়। এক রাগ কৃষ্ণচিন্তা। রাগকৃষ্ণ তার নীলকেশর।

এক পুরুষকেই ধ্যান করবে মঞ্জরী। অনেক পুরুষ জ্ঞান থাকবে না তার। সংসারে আর পুরুষ নেই। এক কৃষ্ণ, আর সবই প্রকৃতি।

ঘাটে চলে আসে রূপমঞ্জরী।

শশিনাথ ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসে।

সরমা বসেছিল ছেলে কোলে নিয়ে।

শশিনাথ আস্তে আস্তে এসে পাশে বসে। সর্বশরীর ওর ঘামছে।

—কী হল ?

শশিনাথ চুপ করে বসে থাকে।

সরমা ছেলেকে আস্তে আস্তে নামায়।

—কী হল ?

শশিনাথ নীরব।

—শরীর খারাপ লাগছে ?

—না।

—তবে ?

—মাস্টার মশাইকে দেখছি না ভোর থেকে।

—সে কি গো!

—তাই তো ভাবছি। কোথায় গেল!

—তবে বোধ হয় কলকাতায় গেছে, বন্ধুবান্ধবদের জানাতে।

—না বলে যাবেন না।

—তা যেতে পারেন।

—মনে হয় না।

—তবে কী মনে হয় ?

শশিনাথ চুপ করে থাকে আবার।

—বিয়ের সব ঠিকঠাক—সরমা বলে।

—সবাই কি জেনেছে ? জিজ্ঞেস করে শশিনাথ।

—সবাই জানে ?

—সবাই জানে, গাঁয়ের সব লোক।

—না। সবাই জানে না। খাঁদু ঠাকুরপোদের বাড়ির ওরা বোধ জানে।

—তা জানুক। আর কাউকে কিছু বোলো না।

—কিন্তু—।

—কিন্তু কী ?

সরমা স্থির হয়ে বসে কী যেন ভাবে।

—একটা কথা বলি তোমায়।

—কী ?

—রাগ করবে না তো ?

—না। কার কথা ?

—তোমার বোনের।

শশিনাথ জিজ্ঞাসুচোখে শুধু তাকায়।

—ঠাকুরঝির ভাব-সাব ভালো দেখলুম না।

—মানে ?

—মানে, তোমার পুরুষের চোখে ও সব ধরা পড়বে না। আমার মেয়েমানুষের চোখে ধরা পড়েছে।

—কী বলো তো ? আমার চোখেও কিছু পড়েছে।

—মানে এই দিনদুয়েক হল ঠাকুরঝি কারো সঙ্গে একটা কথা বলেনি।

—সে তো লজ্জায় হতে.পারে।

সরমা স্পষ্ট করে বলে,—লজ্জায় মোটেই নয়। ও সব আমরা বুঝি।

শশিনাথ আরও চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে।

—কী ব্যাপারটা বলো না ?

সরমা ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলে,—যাই বলো, তোমার বোনের আবার অনেক ইয়ে আছে।

—যা হোক। কী দেখলে বলো।

—ওই তো দেখলুম, মুখখানা যেন আষাঢ়ে মেঘ। দিনরাত কী যেন ভাবছে মনে হল। ঠাকুরঘরেই থাকত বেশীক্ষণ। ভাবটা ভালো লাগল না।

শশিনাথ বলে,—আমিও আজ একটু আগে ওর মুখটা একটু অন্য রকম দেখলুম।

—কেমন দেখলে ?

—যেন তিন-চার রাত ঘুমোতে পারে নি। এমন মুখের চেহারা।

সরমা চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবে।

শশিনাথ গালে হাত দেয়।

—ভেবো না। আমি ঠিক কথা বার করব।

—পারবে ?

—ঠিক পারব। তুমি কিন্তু একটা কথাও বোলো না।

শশিনাথ ঘাড় নেড়ে জানায়, না।

সরমা ওঠে।

বলে,—ঠাকুরঝি কোথায় ?

—বোধ হয় ঘাটে গেল।

—আচ্ছা, আমি ঘাট থেকে আসছি। তুমি বোসো একটু।

শশিনাথ বসে থাকে।

শশিনাথ জানে ভেবে কোন লাভ নেই। তবু মাস্টারের ওপর এত ভালোবাসা পড়েছিল যে কিছুতেই কিছু না ভেবে পারে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভাবতেই হয়। গোঁসাইয়ের যা ইচ্ছে তাই হবে। তার তো কোন হাত নেই এতে!

সরমা একখানা শাড়ি কাঁধে ফেলে। গামছা নেই, তেল মাখবার সময় নেই। একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, ঘাটের পথে এগোয় সরমা।

রোদ তখন চড়া হয়ে আসছে ক্রমশ। ঘাটে হয়তো ভিড় বেড়ে গেছে। একটু পথ এগিয়ে আবার ফিরে আসে ও।

কুয়ো থেকে জল তুলেই স্নান সেরে নেবে। ততক্ষণে রূপমঞ্জরী স্নান সেরে উঠবে এসে ঠাকুরঘরে!

সরমা কুয়োর দিকেই যায় অগত্যা।

একটা কুকুর বসে ছিল কুয়োর পাড়ে। হঠাৎ রেগে একটা মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মারে সরমা। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ শব্দ করতে করতে চলে যায়।

কি বিশ্রী শব্দ! মেজাজটা সরমা ঠিক রাখতে পারছে না কিছুতেই। মনের চাঞ্চল্য বাড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

শুকনো পাতায় পায়ের শব্দে তাকায় সরমা।

ঠাকুরানী এলেন। গাটা যেন জ্বলে গেল ওর দেখে। না স্নান করতে করতে দেরি হয়ে যাবে।

ও সটান চলে আসে রূপমঞ্জরীর কাছে।

রূপমঞ্জরীর মুখখানি বেশ তাজা সরস হয়ে উঠেছে স্নানের পর। মনের গ্লানিও যেন অনেক মুছে গেছে। ও যেতে লিখেছিল। ও নিশ্চিত যে আনন্দলাল চলে গেছে।

সরমা আসতেই মঞ্জরী হাসে।

হাসি দেখে সরমার গায়ের জ্বালাটা বেড়ে যায় আরও।

—ঠাকুরঝি শোন।

রূপমঞ্জরী স্নিগ্ধ হেসে বলে,—ঠাকুরঘর থেকে আসছি বৌদি।

—না, এখুনি শোন।

রূপমঞ্জরী গলার স্বরে চমকে তাকায়। মুহূর্তে ওর মুখটা একটু কঠিন হয়ে আসে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। আবার নরম হয়ে বলে,—তিলক সেরে আসচি।

—না, রান্নাঘরে শোন।

অগত্যা মঞ্জরীকে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়।

সরমা সোজা তাকায় মঞ্জরীর দিকে,—বলে,—কয়েকটা সত্যি কথা বলবে?

মঞ্জরী সব বুঝতে পারে। মনে মনে ওর হাসিও পায়।

বলে,—বলব। মাস্টারকে সকালে দেখেছি কিনা এই তো?

সরমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়।

—দেখিনি।—বলে মঞ্জরী।

—তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল?—জিজ্ঞেস করে সরমা।

রূপমঞ্জরী সরমার অকস্মাৎ এমন কঠিন ব্যবহারে একটু অবাক হলেও জ্বালাটা কোথায় বোঝে।

গম্ভীর স্বরে বলে,—না, কথা কিছু হয়নি।

—তুমি তাকে কিছু বলেছিলে?

—কিছু না।

—মিছে কথা বলছ তুমি।

—আগেই তো বলেছি, মিছে কথা বলিনি।

—তবে সে কি এমনি এমনি চলে গেল?

রূপমঞ্জরী চুপ করে থাকে।

সরমা অধৈর্য হয়ে একটু ধমকেই যেন বলে,—কিছু বলছ না যে!

রূপমঞ্জরী গম্ভীর স্বরেই বলে,—তুমি কতটা কুৎসিত হতে পার, তাই দেখছি।

—হইনি। তুমি করেছ।

—আমি?

—হ্যাঁ। তোমার দাদার মুখখানা দেখলে বুঝতে জ্বালা কত!

রূপমঞ্জরী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

সরমাও।

উনুনটার মুখটা কি বিশ্রী হাঁ হয়ে রয়েছে। এখনও আগুন দেয়া হয়নি। রোদ বেড়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে

চৈত্রশেষের বেলা। বাজার বসতে না বসতে দুপুর। রান্না শেষ হতে হতে রান্নাঘর আগুন হয়ে ওঠে।

এক গোছা সজনে ডাঁটা পড়ে আছে নির্লজ্জের মত।

দাওয়ার ওপর রোদ পড়েছে পেঁপে পাতার ফাঁক দিয়ে গলে। একটা সাদা বাছুর এসেছে পেঁপেতলায়।

সরমার রাগটা একটু পড়ে আসে।

তবু—স্বরের কাঠিন্য একেবারে কমে না,—বলে,—তুমি নিশ্চয়ই জান, মাস্টার কেন গেছে।

—জানি।—বলে রূপমঞ্জরী।

—জান?—সরমা একটু অবাকও হয়।

—হ্যাঁ, জানি। আমি তাকে যেতে লিখেছিলাম।

—কেন ?

—তাকে বিয়ে করতে পারব না বলে।

—কেন, সে কি তোমার যোগ্য নয়।

বড় বড় চোখ তুলে তাকায় রূপমঞ্জরী। স্পষ্ট স্বরে বলে,—না।

রাগে সরমা জ্বলে ওঠে আবার,—আরশিতে নিজের চেহারাটা দেখে এ কথা বলছ ?

—বাইরের নয়। মনের চেহারাটা দেখেই বলছি। এ মন পাবার যোগ্য সে নয়।

—এত অহংকার ভালো নয় ঠাকুরঝি !

রূপমঞ্জরী হাত জোড় করে বলে,—ঠাকুর জানেন। যা সত্য তাই বলেছি। অহংকার করিনি।

সরমা আর সহ্য করতে পারে না,—ভাইকে মারবে, নিজে মরবে, সব জ্বালিয়ে শান্তি হবে।

বলে বেগে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

রূপমঞ্জরী দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

সরমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে।

গিয়ে দেখে শশিনাথ বসে আছে চুপ করে। গালে হাত দিয়ে।

সরমা ঘরে ঢুকে বসে পড়ে।

—যা বলিচি তাই।

শশিনাথ তাকায়।

—পষ্ট বলে দিচ্ছি, তোমার বোনের বিয়ের জন্যে কুমোরবাড়ি থেকে বর তৈরী করে আনতে হবে।

—কী হল ? আস্তে বলে শশিনাথ।

ও বোঝে বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া ননদ ঘরে থাকা কোন বউয়েরই পছন্দ হতে পারে না। ননদের বিয়ে হয়ে কবে বিদেয় হবে, এর জন্যে ব্যস্ততার অন্ত থাকে না। সরমাও ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে।

শশিনাথ কী করবে, ওর তো কোন দোষ নেই। চেষ্টা তো করছেই।

সরমা বলে,—হবে আর কি! বলতে কী চায়, তবে আমার সঙ্গে পারবে কেন। ঠিক কথা বার করেচি।

—কী?

—তোমার বোনই মাস্টারকে তাড়িয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তিনি লিখে জানিয়েছেন, বিয়েতে তার মত নেই।

—শুধু এই!

—না, চলে যেতেও বলেছে এখান থেকে।

শশিনাথ চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে।

সরমার ইচ্ছেটা শশিনাথ গিয়ে মঞ্জরীকে একটু বকুক, একটু সমঝে দিক।

শশিনাথ যেন আরও মিইয়ে যায়। শুধু বলে,—আশ্চর্য!

—আরও কত আশ্চর্য হবে। এই তো সবে শুরু।

শশিনাথ ওঠে।

রূপমঞ্জরীর কাছেই যাবে নিশ্চয়।

ঘর থেকে বেরোয়। সরমা তাকিয়ে থাকে।

না। শশিনাথ ওদিকে যায় না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় নীরবে।

সরমা হতাশ হয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে। ভাইবোনে মিলে যা খুশি করুক। সে আর কিছুর ভেতর নেই। বেশী বাড়াবাড়ি দেখলে সে বাপের বাড়ি চলেই যাবে।

শাড়িখানা আবার কাঁধে নেয়। গামছাটাও।

ঘাটের দিকে যায়।

যাবার আগে ঠাকুরঘরের দিকে তাকিয়ে মঞ্জরীর উদ্দেশ্যে বলে,—বাড়ি খালি রইল, খোকা রইল।

চলে যায় সরমা।

রূপমঞ্জরী ঠাকুরঘরে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। কথাগুলো কিছুই শুনতে পায় না।

ঠাকুরের সামনে প্রণাম করবার ভঙ্গীতে পাদুটি মুড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। কৃষ্ণশরণাগত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখে না ও।

কী ওর ভবিষ্যৎ ও জানে না। কী হবে ওর জীবনে তাও জানে না। সাধারণ মেয়ের মত কোন একটি স্বামী মেনে নেবার মত মনের অবস্থা থাকলে ভাববার কিছুই ছিল না।

কেন তুমি আমায় সাধারণ করলে না। নীলকেশরের সঙ্গে কেন দেখা হল। কেন সব ভুলে গিয়ে জীবনযৌবন শুধু নয়, প্রতিটি মুহূর্ত, এ দেহের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে ফেলল ওকে।

কিছুই তো বোঝে না ও। বোঝে না সংসারে ওর অবস্থা, এ সংসারে ওর স্থান কতটুকু!

বোঝবার উপায় নেই।

বুদ্ধি দিয়ে ভালোবাসা যায় না।

বিচার করে লাভ-লোকসান খতিয়ে ভালোবাসা যায় না।

এ সত্যর উন্মোচন হয়েছে ওর কাছে। ও বৈষ্ণবকন্যা। ও বিচার করতে জানে না। ভালোবাসতে জানে।

এ প্রেম যদি সংসারের ধুলোয় ধুলোয় ক্ষয়ে যায়?

কিছুতেই তা হবে না।

ও নিজে ক্ষয়ে যাবে, নিজে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ওর প্রেম সত্য। শান্ত জ্যোতিতে ভাস্বর, এ আলো নিভবে না। কিছুতেই না।

রূপমঞ্জরী কেঁপে কেঁপে উঠছে আবেগে।

ও জানতে পেরেছে, মনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, ও অন্যায় করেনি। অন্যায় করবার শক্তিটুকুও ওর নেই। সবই আজ নীলকেশরের। অন্যায় যদি কিছু হয় তবে সে তার, ন্যায় যদি কিছু হয়ে থাকে সেও তার। এ দেহের প্রতিটি রূপকণা তার, সর্বস্ব যৌবন তারই।

ওর নিজের কি বাকি রয়েছে আর?

কী করতে পারে ও!

তোমার কী দশা হবে ?—বুদ্ধির প্রশ্ন শোনা যায়।

জানিনে তো। কিছু জানবার চেষ্টাও করিনে।

তবু শেষ পর্যন্ত যদি ঠকতে হয় ?

হবে। দায়িত্ব আমার নয়।

তবে কার ?

তার।

সে তো তোমায় চায় না।

নাইবা চাইল। সে যেমন ভালো থাকে, তেমনি থাক। আমার আনন্দ ওইখানেই। তার ভালোয় আমার ভালো। তার আলোয় আমার আলো। সে যদি না রইল, তবে আমি কোথায় !

তবে তাকে কাছে টেনে নাও। বিয়ে করতে হয়, তাকেই কর।

তাতে আমার সুখ হবে, কিন্তু তার কষ্ট হবে। আমি সইতে পারব না।

তোমার প্রেম সমর্থা।

হবে বা। অত ভাবিনি। তুমি ভেতরে বসে বসে অত হিসেব কোরো না। প্রেম বেহিসেবী। তুমি থামো।

বেশ থামলুম।

এতক্ষণে আরাম পায় রূপমঞ্জরী।

ওঠে। উঠে তিলকমাটি একটু গুলে নেয় হাতের তালুতে।

আরশিটি বার করে সুন্দর করে রসকলি আঁকে। ফুলগুলো ছড়িয়ে গিয়ে বসে।

একটি মালা গাঁথবে আজ। তাকেই দেবে। উদ্দেশ্যে।

তাই বা কেন। একবার যাওয়াও যায়।

রূপমঞ্জরী মালা গাঁথে।

দিন কেটে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শশিনাথ দোকানে বেরিয়েছিল। ফেরেনি এখনও। সরমা মঞ্জরীর সঙ্গে কথা বলেনি। মঞ্জরী দু-একবার কথা বলবার চেষ্টা করে চুপ করে গেছে।

বোবার সংসার হয়ে উঠছে ক্রমশ।

রূপমঞ্জরী বিকেলে বেরোয় একটু। কোথায়ই বা যাবে?

গোঁসাইয়ের ভিটের দিকে একবার গেলে হয়। যাবে? দোষ কি গেলে। বাড়িতে থাকতে ভালো লাগছে না।

একটুও ভালো লাগছে না।

সরমা ছেলে কোলে নিয়ে বেরিয়েছে। পাড়ার কোন বাড়িতে হয়তো, নয়তো ঘাটের ধারে। সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত একটা জটলা হয় মেয়েদের।

কথাগুলো যা হয় সেখানে খুব ঝাঁঝালো মুখরোচক।

রূপমঞ্জরীর ভালো লাগে না ওসব জায়গায় যেতে।

ও সময়টুকু ঠাকুরঘরে বসে থাকতেও ভালো লাগে।

ভাবতে ভাবতে ও কলাবাগান পেরিয়ে এসেছে। ওই দেখা যায় গোঁসাইয়ের ঘর। কতদিন যেন এ ধারে আসেনি মনে হয়।

ওই তো কামরাঙা গাছের পাতার ওপর পিছলে পড়ছে বিদায়ী সূর্যের ম্লান আলো।

রূপমঞ্জরী দাঁড়ায়।

যাবে ঘরে? ঘরে ঢুকবে?

ঢোক না। যার জন্যে সব ত্যাগ করলে, তাকে সবটুকুই পেতে হবে।

আবার বুদ্ধির কথাগুলো শুনতে পায় ভেতরে।

না। কথাটা ঠিক হল না।

সব যদি ছাড়তেই পারি। তবে তাকেই আসতে হবে। আমায় যেতে হবে না।

কিন্তু কি সুন্দর বলো তো! নিটোল কাঁধের ওপর নেমে পড়েছে বড় বড় কালো চুল। চোখদুটি যেন টলমল করছে! কি বিশাল বুক। অত বড় বুকেও কি একটু জায়গা হবে না তোমার?

লোভ দেখিও না।

এ লোভ নয়। অধিকারের কথা।

অধিকার থাকলে আপনি পায়। তার জন্যে জোর করতে হয় না।

কিছুদিন আগেও তো ওকে গ্রাস করতে চেয়েছিলে। ওর সব চেয়েছিলে।

তখন আনন্দলাল ছিল।

আনন্দলালের কী দোষ?

দোষ কিছু নয়। আনন্দলালের থাকাটাই আমার সবটা বুঝতে দেয়নি আমাকে।

একটু হেঁয়ালী হল।

হেঁয়ালী নয়। আনন্দলাল আছে—এই বোধ আমাকে লোভী করেছিল।

আনন্দলাল তোমার ক্ষতি করেছে?

না, উপকার করেছেন। উনি চলে গিয়ে আমায় আরও স্বচ্ছ করেছেন। সহজ করেছেন।

নীলকেশরকে মুগ্ধ করতে চাওনি?

চেয়েছিলাম।

কেন?

আনন্দলাল আমার অহংকার বাড়িয়েছিল।

কিসের অহংকার?

রূপের। যৌবনের।

সে অহংকার কি আজও গেছে?

রূপমঞ্জরী ভালো করে তাকায় নিজের সর্বাঙ্গে।

নীলকেশরকে দেখা যায় ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়েছে।

ভেতরে যে স্পষ্ট কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

স্তব্ধ নিথর হয়ে আসে মনের আবেগগুলো।

প্রাণরসে ডুবতে চায় যেন। প্রাণ ভরে দেখতে পায়। এই আনন্দ।

একবার শুধু দেখতে পাওয়া। তাতেই ডুবে যাওয়া।

মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে। কিছু অসুখ করেনি তো!

চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলকেশর।

তাকিয়ে রয়েছে সামনে ক্ষেতের শেষে দূর বনরেখায় চোখ রেখে। দৃষ্টি কোথাও আটকে নেই। কি অদ্ভুত দৃষ্টি।

রূপমঞ্জরী এগোয় একটু।

মুখচোখ শুকনো। একটু যেন নীরস।

বুকটা কাঁপে ওর। অসুখ করেনি তো!

আরও একটু এগোয়। আরও।

ঘরের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

দেখছে। চোখের আর তৃপ্তি হয় না। দুটো চোখে দেখে মন ভরে না। বিধাতা কেন অনেক চোখ দিল না রূপমঞ্জরীর। অনেক বেশি, আরও অনেকটা দেখতে পেত!

নীলকেশর ঘুরে দাঁড়ায়।

রূপমঞ্জরীর বুকটা কেঁপে ওঠে।

ঘরের আরও কাছে এসেছে।

নীলকেশর তাকায়।

সমস্ত দেহখানি যেন টঙ্কার দিয়ে ওঠে। সুরনিনাদে বেজে ওঠে।

নীলকেশর চোখে চোখ রাখে।

রূপমঞ্জরীর বড় বড় চোখদুটোয়। অপরূপ কারুণ্য মূর্ত হয়ে ওঠে।

নীলকেশরের একটু ভীত চাউনি। একটু বা আতঙ্কিত।

ঘরের ভেতর ঢুকে যায় নীলকেশর। যেন পালিয়ে যায়।

রূপমঞ্জরী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে।

নিজেকে একটু সময়েই সংযত করে নেয় রূপমঞ্জরী।

তাই হোক। ও যা চায় তাই হোক। ওর কষ্ট হলে ওর কাছে আর আসবে না মঞ্জরী।

ওকে দেখে যদি ভয় পায়। তবে কখনও নীলকেশরের চোখের সামনে আসবে না। কখনও না।

ওর ভালো হোক। ও সুখে থাক। ও আনন্দে থাক।

প্রাণের প্রার্থনার আবেগ চোখে মুখে নরম ভাবমাধুর্য প্রকাশ পায়।

আস্তে আস্তে ফিরে আসে রূপমঞ্জরী।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই।

ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে, বৃন্দারানীর মঞ্চে প্রণাম সেরে নাম ধরবে রূপমঞ্জরী। মনপ্রাণ ঢেলে দেবে আজ নামে। সব ঢেলে দেবে। আজ আর কান পেতে তার নাম শোনবার মানুষ নেই।

আনন্দলাল নেই।

একটা নিশ্বাস পড়ে রূপমঞ্জরীর। ঠাকুরঘরে ঢোকে।

শশিনাথ আজ আর বেশী দেরি করেনি। সকাল সকাল ফিরেছে। ওরও মুখখানা শুকিয়ে গেছে একদিনে। নীরবে এসে দাওয়ার ওপরে বালতিতে তোলা জলে পা ধুয়ে ঘরে এসে বসে থাকে।

সরমা রান্নাঘর থেকে টের পায় শশিনাথ এসেছে।

রান্নাঘর থেকে উঠে ঘরে আসে সরমা।

শশিনাথ চুপ করে বসে ছিল, তেমনি বসে থাকে। তাকায় না ওর দিকে।

সরমা শশিনাথের কাছে বসে।

—রান্না হয়ে গেছে।

শশিনাথ কথা বলে না।

—খাবে না?

শশিনাথ তাকায়।

—খিদে নেই।

সরমা বলে,—না খেয়ে কোন লাভ হবে না। মিছে শরীর খারাপ হবে।

শশিনাথ তেমনি নীরবে বসে থাকে।

সরমা ওর দিকে একবার তাকিয়ে বলে,—তার চেয়ে একটা কাজ করলে হয়।

শশিনাথ আবার তাকায়।

—ঠাকুরঝির জেদেই যে চলতে হবে, এমন তো কিছু কথা নেই।

শশিনাথ একটু বিরক্ত হয়,—কী বলতে চাও তুমি।

—এ বিয়ে ঠিক করতেই হবে।

—কী করে?

—তুমি বরং কলকাতায় যাও কালই।

—কাল নয়। পরশু তো দোকানের মাল আনতে যাবই।

সরমা ফিসফিস করে বলে,—তবে তো ভালই। গিয়ে মাস্টারের সঙ্গে দেখা করো।

—তাড়িয়ে দিয়ে আবার দেখা করা। লজ্জা নেই আমার?

—তুমি তো তাড়াও নি! তুমি ঠাকুরঝির কথা উড়িয়ে দেবে। বলবে, ও ছেলেমানুষ, ও কী বোঝে!

—তারপর!—শশিনাথের কথাটা মন্দ লাগে না।

শশিনাথ একটু নড়েচড়ে বসে। সরমার কাছে এগোয়।

সরমা নিজের বুদ্ধির তারিফে নিজেই একটু হাসে।

খুব কাছাকাছি এসে বলে—ঠাকুরঝির জিদ বজায় থাকবে, এ কেমন কথা!

আবার একটু চুপ করে থেকে বলে,—মেয়েমানুষের জিদকে অত প্রশ্রয় দিলে শেষকালে ভুগতে হবে তোমায়।

শশিনাথ বলে,—তা তো বুঝলুম। কী করব বলো।

—তুমি মাস্টারকে বলো। বিয়ের সব ঠিক।

—তা কি শুনবে?

—কেন শুনবে না? ঠাকুরঝির বিয়ের কর্তা ঠাকুরঝি নয়, তুমি।

—যদি বলে মেয়ের অমতে বিয়ে কী করে করি!

—বুঝিয়ে বলবে, মেয়ের মত হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম অমন একটু অমত থাকে।

—তবে যাব বলছ?

—নিশ্চয়ই যাবে।

—আমার যেতে কেমন বাধো-বাধো লাগছে!

—বড্ডী ভতু তুমি! পুরুষ মানুষের অত ভাভু হলে চলে? তবেই হয়েছে।

শশিনাথ তবু চুপ করে বসে থাকে।

কি যেন ভাবে বসে বসে।

ঝিঁঝিঁর ডাক একটানা ভেসে আসে কাছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় আকাশটা কালো। অন্ধকার।

দিশেহারা গভীর আকাশ।

ঠাকুরঘরের শিকলের শব্দ হয়।

—কে? চমকে ওঠে শশিনাথ।

—বোধহয় ঠাকুরঝি।

শশিনাথ আবার বসে বসে কী ভাবতে থাকে।

—কী ভাবছ?

একটা নিশ্বাস ফেলে শশিনাথ সরমার দিকে তাকায়।

—কী যে ছাই ভাবো।

—ভাবছি কী হবে গিয়ে!

—কেন?

—গোঁসাইয়ের ওপর নির্ভর করে বসে থাকাই ভালো!

সরমার মোটেই পছন্দ হয় না কথাটা,—নির্ভর মানে? তবে ভগবান হাতপা দিয়েছেন কেন। দিনরাত্তির সংসারে সব ব্যাপারে নির্ভর করে সকলের চলে না।

—তাও বটে!

—বটে আবার কি! তোমাকে যেতেই হবে। এ ব্যাপার নির্ভর-টির্ভর নয়।

সরমার গলায় বেশ ঝাঁজ। ওর আসল রূপটা প্রকাশ পেয়েছে যেন।

শশিনাথ তবু বলে,—যাব বলছ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে।

আর কথা বলে না শশিনাথ। সরমার মেজাজটাকে ওর ভয় হয় আজ।

তবু সরমার কথাটা মনেপ্রাণে মেনে নিতেও পারে না।

আজন্ম গোঁসাইয়ের কৃপায় নির্ভর করে অভ্যস্ত ওরা। ওদের চিন্তা ভাবনা ধাতে সয় না। আবার মনে হয় সরমার কথাটাও ফেলবার নয়।

যেতে একবার হবেই। নইলে টিকতে দেবে না সরমা। দিনরাত্রি অতিষ্ঠ করে মারবে ওকে।

তা ছাড়া গিয়ে একবার বলতেই বা ক্ষতি কী?

মঞ্জরীর লেখাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেই চলবে।

ও ছেলেমানুষ। ও কী বোঝে! কিছু মনে করবেন না আপনি। মঞ্জরীর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে—দেখবেন। মঞ্জরীকে আমি চিনি। ওর আপনার ওপর টানই যদি না থাকবে, তবে আপনার অত সেবা করবে কেন? যাই বলুন, অসুখে অমন সেবা করতে পারা প্রাণের টান ছাড়া হয় না।

চিঠিটা? ওটা মানে আমার ওপর রাগ করে। টাকাপয়সা নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল তাই। ওটা কিছু নয়।

মনে মনে কথাগুলো আওড়ায় শশিনাথ।

এই ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারলে—বুঝবে নাই বা কেন!

ওঠে শশিনাথ,—চলো খেতে দেবে চলো।

—চলো।

—শোন, ঠাকুরঝিকে একটু কিছু তোমার বলা উচিত ছিল।

—কী বলব বলো?

—বারে বা! কী বলবে, কী করে বলবে, কখন বলবে—সব শিখিয়ে দিতে হবে!

—শশিনাথ একটু মাথা চুলকোয়।

—যা বলবার তুমিই বোলো।

—আমার বলা আর তোমার বলায় আকাশপাতাল তফাত। সরমা বিরক্ত হয়ে বলে,—আচ্ছা বোনকে কিছু বলতে বললেই এড়িয়ে যাও কেন বলো তো?

—শশিনাথ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। মুখটা একটু ম্লান হয়।

—শুনবে কারণটা ?

—বলো না। আমি মনে করব না কিছু।

—কি জান, বাবা নেই, মা নেই, একটামাত্র বোন। ওকে কিছু বলতে আমার বড় মনে লাগে। কিছুতেই ওকে কিছু বলতে পারি নে।

সরমা লক্ষ্য করে শশিনাথের গলাটা ভারি হয়ে আসে।

কোন কথা বলে না।

শশিনাথের গলাটা খুব ভিজে ওঠে,—আমি ছাড়া ওর আর কে আছে বলো! তাই তো যেতে চাইছি না। ভাবছি, আমি জোর করলে ও বিয়ে হয় তো করবে। কিন্তু— ।

—কিন্তু কী ?

—সত্যিই যদি ও অসুখী হয় !

—সত্যি অসুখী কোন মেয়েমানুষ হয় না।

—কী করে বুঝলে ?

—মেয়েরা যে কোন পুরুষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সংসার করতে পারে।

—সব মেয়ে পারে না। মঞ্জরীকে তুমি যতটা জান, তার চেয়ে ভালো করে আমি জানি। একটু থেমে আবার বলে শশিনাথ,—ও বড় অভিমানী। বড্ড নরম আবার খুব কঠোর।

সরমা কথা বলে না!

কথা বলতে চায় না। শশিনাথের কথাগুলো অন্তরের গভীর থেকে এসে কানে লাগে। কথাগুলো অস্বীকার করতে শশিনাথের জন্যে বেদনা বোধ হয়।

—তবে যা ভালো বোঝ, তাই করো।

—রাগ কোরো না সরমা।

—রাগ করবার আমি কে ?

—তুমি ভুল ভেবো না আমায়। মঞ্জরী যাতে সত্যি অসুখী হয় এটা আমি চাই না।

—বেশ তো তবে নাই গেলে।

একটু চুপ করে শশিনাথ বলে,—কলকাতায় যাব। দেখাও করব। কিন্তু কথা বলব সেখানকার অবস্থা বুঝে।

—তাই কোরো।

সরমা আর আপত্তি করে না।

—খাবে চলো।

শশিনাথ আস্তে আস্তে বেরোয়। খেতে যায় রান্নাঘরের দিকে।

রাত কাটে। পরের দিনটাও কেটে যায়। কথা নেই। যে যার কাজ করে যায়। বাড়ির আকাশে নিস্তরঙ্গ এক বেদনার আস্তরণ পড়েছে যেন। মন ভার। দেহ ক্লান্ত। মুখ সব গম্ভীর। কালিমাখা।

রূপমঞ্জরী ঠাকুরঘরেই থাকছে বেশী।

সন্ধ্যায় শুধু নয়, কান পাতলে শোনা যায় রাত্রেও নাম করছে রূপমঞ্জরী।

এমন গুমট নীরবতা শুধু ভেঙে ভেঙে পাতলা হয়ে আসে ওর নামের সুরে।

সরমাকেও কান পেতে থাকতে হয়!

কি মধুর স্বর ঠাকুরঝির!

রাত যায়। আবার দিন আসে।

আজ দুপুরে খাওয়া সেরে কলকাতায় যাবে শশিনাথ।

কথায় কথায় কথাটা শুনিয়ে দেয় সরমা রূপমঞ্জরীকে।

শশিনাথও সকালে দোকানে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরে। দোকানের মাল খরিদের ফর্দ নিয়ে আসে। কাপড়জামা গোছগাছ করে স্নান করতে যায়।

স্নান সেরে ফেরবার পথে বারে বারেই মনে হয় ওর আনন্দলালের কথা। আজ দেখা হবে। সন্ধ্যায়। দোরের কাছে আসতেই পিওন একখানা চিঠি হাতে দেয়।

খামে ভরা চিঠি। তার নামে।

তার নামে কে চিঠি দিল?

কোন মহাজনের তাগাদা? না, কারো তো টাকা বাকী নেই।

তবে কে?

চিঠিখানা খুলে ফেলে শশিনাথ।

ভিজে কাপড়ে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়ে চিঠিখানা।

কোন সম্বোধন নেই গোড়ায়।

"না বলে চলে আসতে হয়েছে। বিশেষ কয়েকটি কারণে। আমাকে ক্ষমা কোরো ভাই। জীবনে মাত্র দুখানি চিঠি এর আগে লিখেছিলাম। আর এই তৃতীয়।

চিঠি লেখা আমার একেবারেই অভ্যেস নেই। ভালোও লাগে না। প্রয়োজনও মনে হয় না।

তবু এ চিঠিখানা না লিখতে পেলে শান্তি পাচ্ছি না। তোমার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তোমাকে ভালোবাসি, তাই তোমার কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে চাই নে।

শুধু কি এই! অপরাধ আরো গুরুতর।

অন্য কেউ হলে বলতে সাহস পেতাম না। কিন্তু জানি, তুমি বৈষ্ণব। ক্ষমা করা তোমার ধর্ম। তাই ক্ষমা চাইবার প্রয়োজনও মনে করি নে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, রূপমঞ্জরীকে ভালো লেগেছিল। তাই ওকে আরও কাছে পাবার লোভ সামলাতে না পেরে ওকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গিনী করে নিতেও চেয়েছিলাম।

চাওয়াটা যে কত বড় ভুল হয়েছিল, আজ দূরে এসে টের পাচ্ছি।

প্রথম কথাটা শুনে চমকে যেও না। আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী উমার কাছেই এসেছি। ও এতকাল তপস্যা করেছিল আমাকে মালিন্যহীন করে শুদ্ধ করে নিয়ে গ্রহণ করতে। ওর তপস্যা সার্থক হয়েছে। বোধ হয় ওর কাছে। আমার কাছে নয়।

আমার কাছে রূপমঞ্জরীর কৃপা আমায় ধন্য করেছে।

রূপমঞ্জরীকে বোলো, ওর আলোয় আমি আলোকিত হয়েছি।

আনন্দের গভীরতার স্বাদ কোথায় তার আভাস পাচ্ছি। সব ওর জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

তাই রূপমঞ্জরীকে আমি শুধু ভালোবাসি তাই নয়, যে প্রেমে এ বিশ্বসংসারটার শুরু আর শেষ, সেই প্রেমের মঞ্চে ওর অভিষেক করতে কবে পারব, সেই সাধনায় জীবনের বাকি কটা দিন কাটবে বলে নিশ্চিত বুঝতে পারছি।

রূপমঞ্জরী আমার গুরু। ওকে আমার অনন্তকালের প্রণাম গ্রহণ করতে বোলো।

ওকে বোলো, আমার অন্তরে ওর আসন চিরকালের জন্যে পাতা রইল।

তুমি আমার প্রীতি জেনো। আমার নীচের ঠিকানায় দেখা কোরো। গান শিখতে আসতেও পারো।

—আনন্দলাল।

চিঠিখানা বার বার পড়তে লাগল শশিনাথ। চৈত্রের তপ্ত রৌদ্রে ভিজে কাপড় শুকিয়ে এল। তবু চিঠিখানা পড়তেই থাকে। একবার দুবার, তিনবার, বার বার।

সরমা রান্নাঘরে যাচ্ছিল। নজরে পড়তেই বলে,—কী হল? তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছ?

চোখে মুখে অজস্র কৌতুহল আর হাসি নিয়ে শশিনাথ বলে,—চিঠি।

—কার?

—মাস্টারের।

দোরের কাছে এগিয়ে যায় সরমা।

—কী লিখেছে?

শশিনাথ চিঠিটা নিয়ে ভেতরে আসে।

ঘরে গিয়ে সরমাকে চিঠিটা পড়ে শোনায়।

সরমার মুখখানি শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। না জেনে সে মঞ্জরীর কাছে কত অপরাধ করেছে, কত রাগ করেছে। ছি, ছি! নিজের ওপর ভারি বিরক্ত হয় সরমা।

—দেখলে তো গোঁসাইয়ের ইচ্ছেয় বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে।

সরমা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

—বিয়ে হলে কী সর্বনাশ হত সতীনের ঘরে পড়ত মেয়েটা।

সরমা নীরবে বসে থাকে।

—যাও। চিঠিখানা নিয়ে এখুনি মঞ্জরীকে দেখাও। ওর কথা লেখা আছে।

—দাও।

বলে চিঠিটা নিয়ে সরমা ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরের দিকে যায়।

রূপমঞ্জরী ঠাকুরঘরে।

দোর খুলে ঢোকে। মঞ্জরী ঠাকুরের সামনে হাত জোড় করে কী যেন বলছে।

কথাগুলো একেবারে বোঝা যায় না।

সরমা চিঠিখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—ঠাকুরঝি।

সরমার ডাকে ফিরে তাকায় রূপমঞ্জরী।

একটু হেসে বলে,—বৌদি! কিছু বলবে?

সরমা কাছে এসে ওর হাত ধরে,—আমায় ক্ষমা করো ঠাকুরঝি!

রূপমঞ্জরী মৃদু হাসে, বলে,—ও কথা বলতে নেই।

সরমার পায়ের ধুলো নেয়।

—এই চিঠিটা পড়ো। আমি তোমার দাদাকে ভাত দিই।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সরমা।

রূপমঞ্জরী চিঠিটা খোলে। পড়ে, আবার পড়ে।

বড় মধুর হাসি ওর পাতলা ঠোঁট দুখানিতে, ডাগর চোখদুটি কি শান্ত আর ঠাণ্ডা!

চিঠিখানা পাশে রেখে হাত দুটি জোড়া করে তাকিয়ে থাকে সামনে।

চন্দনের সুবাসে ভরা ঘরের বাতাস। গোবিন্দমূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে রূপমঞ্জরী।

পাথরের মূর্তিতে মূর্ত হয় আর-এক রূপ।

রূপমঞ্জরী দেখে। আবার প্রণাম করে। রসে টলমল ডাগর দুটি চোখ। গভীর অতল। রূপমঞ্জরী টের পায় না কখন ওর মসৃণ গালদুটি ভেসে গেছে চোখের জলে।

আরও অনেক পরে ও ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে ও রান্নাঘরে খেতে আসে।

দিন যায়। রাত যায়। আরও কয়েকটা দিন কেটে যায়।

২১

সেদিন সন্ধ্যা থেকে নীলকেশর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে।

ভজনে বসল। দশহাজার জপ করবার পরও মন একাগ্র হতে পারছে না শ্রীপাদপদ্মে।

মনকে গুটিয়ে এনে ঢেলে দিতে পারছে না ইষ্টচরণে।

এ কী হল নীলকেশরের ?

মন যেন এলিয়ে গেছে। অর্থহীন কল্পনার পিছনে ছুটতে চাইছে।

তাই যাক। মনকে আরও আলগা করে দেয় নীলকেশর। এবারে ধীরে ধীরে এক বিন্দুতে গিয়ে স্তব্ধ হয় মন।

সেখানে এক কন্যা—রূপমঞ্জরী।

যোগমায়ার আকর্ষণের তীব্রতায় নিজেকে যেন অসহায় মনে হয় ওর। নিতান্ত অসহায়।

তার সাধনশক্তি অতিক্রম করে গেছে।

সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে যেন। মনে আর এক ফোঁটা জোর পায় না।

পরমা রূপসী মায়ার আকর্ষণে বিবশ হয়ে আসে।

রূপমঞ্জরীর অসামান্য আবির্ভাব ওর সাধন-জীবনে নিদারুণ নিষ্ঠুর মায়ালীলা।

অনন্ত কৌতুকময়ীর নিত্য নূতন কৌতুকে বিবর্ণ করে ফেলেছে নীলকেশরকে।

ওর অন্তর থেকে বলে, শরণাগত হতে হবে।

তারই কৃপার ওপর ঢেলে দিতে হবে নিজের সর্বস্ব।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে নীলকেশরের বুক থেকে।

এতক্ষণে যেন ও একটু আরাম পায়। আর যুদ্ধ নয়, এবার শরণাগত।

সাধনযুদ্ধে যোগমায়াকে জয় করা সম্ভব নয়।

এবারে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে নীলকেশর।

রূপমঞ্জরীর কাছে যেতে হবে। গিয়ে বলতে হবে, তোমার শরণাগত হলাম। এবার তোমার যা ইচ্ছা তুমি কর।

যদি রূপমঞ্জরী তাকে গ্রহণ করে। এ জন্মের সাধনস্বপ্ন তার ভেঙে যাবে। এ জন্মে এখানেই শেষ করতে হবে।

কিন্তু শরণাগত হওয়া ছাড়া আর জয় করার কোন পথ নেই!

একমাত্র এই পথেই কৌতুকময়ীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও হওয়া যায়।

যদি অতিক্রম করতে না পারে, তবে এ জন্মে আর কৃষ্ণসাধন হল না।

সব ভেসে গেল!

নীলকেশরের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আবার।

এত দিনের সাধনের এই হবে শেষ পরিণতি!

যদি তাই হয়, হবে।

মনের সুতীব্র ভাবস্রোতে বাধা দেবার আর তার সাধ্য নেই।

এবার নিজেকে ভাসালাম। কৃপার ওপর নির্ভর।

পরমা শক্তির শরণাগতি। রূপমঞ্জরী শক্তির প্রকাশ। মায়া বিভবের বিকাশ।

ও কৃপা করে বাঁচালেই বাঁচবার পথ আছে।

নীলকেশর তার শেষ সাধন স্থির করে নিয়েছে।

এই তার জীবনের শেষ সাধন। আর না হয় এই কৃষ্ণসাধনের শুরু।

এবার গোপীজনের কাত্যায়নী-কৃপায় নির্ভয়।

নীলকেশর ওঠে।

রাত ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে।

নিজের থলিটি ঠিক করে নেয় নীলকেশর।

দরজার সামনে গিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। ঘন নীল আকাশে ছোট ছোট তারাগুলো একই নিয়মে ওঠে ডোবে।

সবাই সকলের প্রেমে ডুবে আছে। প্রতিটি গ্রহের আকর্ষণে প্রতিটি গ্রহের স্পন্দন।

কি কঠিন নিয়মে এদের মুহূর্ত বাঁধা পড়ে গেছে।

মনের ভেতরটায় করুণা জাগে।

তোমরাও শরণাগত হও;— আপন মনেই বলতে ইচ্ছে হয় নীলকেশরের।

দরজা থেকে পথে নামে।

২২

গভীর রাত্রে রূপমঞ্জরী অনেকক্ষণ বসেছিল। ঘুম আসছে না। ঘরের দরজায় কে যেন ঘা দিচ্ছে। খুব আস্তে। খুব আস্তে।

কে? চমকে ওঠে রূপমঞ্জরী।

তবে কি আনন্দলাল ফিরে এল আবার।

আবার ঘা পড়ে দরজায়।

আস্তে আস্তে ওঠে মঞ্জরী। বুকটার ভেতর কাঁপে। তবু নিজেকে সংযত করে দরজার কাছে যায় মঞ্জরী।

না, আনন্দলাল আবার আসতে পারে না। আর কিছু বলতে পারে না। তবে কে এল?

দরজাটা খোলে।

সামনের লোকটিকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

গেরুয়া পরনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মচারী নীলকেশর।

মঞ্জরী শুধু দাঁড়িয়েই থাকে।

একটা কথাও বলতে পারে না। সে কি স্বপ্ন দেখছে ?

নীলকেশর একটু হাসে। গভীর ম্লান হাসি।

ঘরে ঢোকে নিজেই।

দোরটা ভেজিয়ে দেয় রূপমঞ্জরী।

ওর হাতপা কাঁপছে। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করে।

নীলকেশরের হাতে গেরুয়া থলেটি। হাতে কম্বলখানি ভাঁজকরা।

মঞ্জরী একটু বুঝতে পারে এতক্ষণে। চলে যাচ্ছে নীলকেশর।

ওর দিকে তাকায়।

নীলকেশর তাকায়।

অনেকক্ষণ দুজন নীরবে তাকিয়ে থাকে।

নীলকেশর আবার হাসে একটু। সেই ম্লান বেদনার হাসি।

—হেরে গেলাম।

—বলে ফিসফিস করে নীলকেশর।

চমকে তাকায় রূপমঞ্জরী।

—হেরে গেলাম। তুমিই জিতেছ।

রূপমঞ্জরী ভয়ে ভয়ে তাকায় নীলকেশরের দিকে।

—হেরে গেছি। একথাটাই বলতে এলাম। আজই চলেছি গোঁসাইয়ের ভিটে ছেড়ে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? এখন তুমি যা বলবে তাই হবে।

যোগমায়ার শরণাগত হয়েছে নীলকেশর।

রূপমঞ্জরী তখনও কাঁপছে। সে যা বলবে তাই হবে। তার কাছে আত্মসমর্পণ করছে আজ নীলকেশর। কী বলবে ও! কী করবে! আনন্দে থরথর করে কাঁপছে ও।

নীলকেশর এসে নিজেই ওর একখানি হাত ধরে।

—চল। যেখানে তুমি বলবে, সেখানেই যাব।

রূপমঞ্জরী একবার তাকায় ওর দিকে,—কিন্তু তোমার সাধন?

একটু হাসে নীলকেশর। ম্লান হাসি।

রূপমঞ্জরী আস্তে আস্তে ওর বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিশাল বুকখানার ওপর মুখ রাখে।

চোখদুটো ওর অনেক জলে ভরে ওঠে। তাকাতে পারে না।

ওর সব সাধ এমন করে মিটবে, এ যে ও স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কৃষ্ণকরুণায় ভরে উঠেছে রূপমঞ্জরী। আর কোন তৃষ্ণা নেই। সব তৃষ্ণা মিটে পরম তৃপ্তিতে ভরে গেছে মন।

আস্তে আস্তে ওর বুক থেকে মুখ তোলে রূপমঞ্জরী।

সমস্ত মুখখানা চোখের জলে ধুয়ে গেছে।

তাকায় ও নীলকেশরের দিকে। বলে,—না। হারতে তুমি পারবে না।

নীলকেশর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মঞ্জরীর গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে,—তুমি হেরে গেলে আমি যে কিছুতেই সইতে পারব না। কিছুতেই না।

নীলকেশরের হাত দুটো চেপে ধরে ঝাঁকায় রূপমঞ্জরী।

—তুমি চলে যাও। এখনি চলে যাও।

নীলকেশরের পদ্মপাপড়ির মতো চোখদুটি টলমল করে যেন সরোবরের ছায়ায়।

—যাও তুমি। যাও।

হাতদুটো ধরে ঝাঁকায় রূপমঞ্জরী!

নীলকেশর আবার বলে,—এ কি তোমার শেষ আদেশ।

—হ্যাঁ। আমার আদেশ। তুমি যাও। কেন হেরে যাবে তুমি? তবে আর কী নিয়ে বাঁচব?

চোখের জলে আবার দুটো চোখ ভরে যায় রূপমঞ্জরীর।

নীলকেশর বলে,—তবে আমি যাই।

রূপমঞ্জরী হাতটা চেপে ধরে আবার। চলে যাবে নীলকেশর? একেবারে?

গলায় আঁচল দিয়ে উপুড় হয়ে নীলকেশরের বড় বড় পাদুখানির ওপর মাথাটা রাখে মঞ্জরী।

রাত শেষ হয়ে আসছে প্রায়। টুকরো জানালা দিয়ে আকাশটা চোখে পড়ে নীলকেশরের। তারায় ভরা সুনীল আকাশ। মধুর আনন্দে ঝিকমিক করছে তারাগুলো। বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা।

নীলকেশর নিজের পায়ের ওপর থেকে রূপমঞ্জরীর মুখটা দুহাতে ধরে তোলে।

রূপমঞ্জরী তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে।

নাকের রসকলি ধুয়ে গেছে চোখের জলে। টিকালো নাকের পাতাদুটি ফুলে ফুলে ওঠে ওর।

—আমাকে আশীর্বাদ কর। আমাকে কৃপা কর।

বৈষ্ণবকন্যা রূপমঞ্জরীর ভিক্ষা।

—সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ করতে নেই,—বলে নীলকেশর,—তবু তোমাকে শুধু বলছি। রাত্রে এই সময়ে যখনই তুমি আমাকে দেখতে চাইবে, দেখতে পাবে। তোমার আকর্ষণ আমাকে টেনে আনবে এখানে। আমার কিছুমাত্র সাধন থাকলে এ কথা মিথ্যে হবে না জেন।

জয় রাধে!

নমস্কার করে নীলকেশর রূপমঞ্জরীর সামনে।

জয় রাধে!

ধীরে ধীরে দোরের কাছে আসে নীলকেশর।

চোখদুটো বুজে আছে রূপমঞ্জরীর।

দরজার বাইরে অন্ধকারে নেমে চলে যায় নীলকেশর।

চলে গেল।

নীলকেশর চলে গেল!

বুকের ভেতরে ওর যাবার পথের প্রতিটি পদধ্বনি শুনতে পায় রূপমঞ্জরী। শুয়ে পড়ে ও।

সমস্ত গ্রামখানা শূন্য হয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে রূপমঞ্জরীর।

কেটে গেছে আরও কয়েক বছর। এখনও মাঝে রাঝে রাত্রে দেখা যায় ওর ঘরে প্রদীপ জ্বলে। দেখা যায় নিশ্চল হয়ে বসে আছে ও বিছানার ওপর। খুব সন্তর্পণে কান পাতলে শোনা যায় কী যেন বলছে। গভীর রাতে ঝিঁঝিঁর শব্দের ভেতর দিয়েও শোনা যায় ফিসফিস করে গাইছে মঞ্জরী। 'এই ছয় গোঁসাই যবে করুণা করিবে। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা অবশ্য দেখিবে॥'

চোখের ঘন পল্লব দুটি বোজা। রসকলি-আঁকা টিকালো নাকের পাতাদুটি ফুলে ফুলে উঠছে। কাঁপছে রূপমঞ্জরী। মাঝে মাঝে বেঁকে যাচ্ছে সর্বশরীর।

উপুড় হয়ে পড়ছে যেমন করে পড়েছিল নীলকেশরের পায়ের ওপর।

নীলকেশর ওর কাছে এসেছে। ও দেখছে। সংসারে কেউ দেখছে না। শুধু ও দেখছে।

নীলকেশরের কথা মিথ্যে হবার নয়। ওর প্রেম মিথ্যে নয়।

বাইরে জানালা দিয়ে দেখছিল শশিনাথ আর সরমা।

ভয়ে ভয়ে সরমা শুধায়,—কী হয় ওর রোজ রাত্তিরে।

শশিনাথ ঠোঁটে আঙুল দেয়,—চুপ। আবেশ হয়।

ওঁ মধু! ওঁ মধু!! ওঁ মধু!!!